বিশেষ সংখ্যা

মহাপ্রাচীর

স্বদেশের সাথে প্রবাসের অনন্য সেতু বন্ধন

১১ তম সংখ্যা | জুলাই ২০২৪

জুলাই'২৪: তারুণ্য ও নতুন বাংলাদেশ

বাংলাদেশ-চীন ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের একটি প্রকাশনা

সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক	:	এ বি সিদ্দিক
নির্বাহী সম্পাদক	:	জান্নাতুল আরিফ
সহযোগী সম্পাদক	:	এন্ড্রু দাস শুভ্র
সম্পাদনা সহকারী	:	মঈন উদ্দিন হেলালী তৌহিদ
		ডা: মো: মনিরুজ্জামান শিহাব
		রাওহা বিন মেজবা
প্রচ্ছদ ও ডিজাইন	:	নুহু ইবনে শহিদ
তত্ত্বাবধানে	:	অধ্যাপক ড. মো: সাহাবুল হক
		ড. এ এ এম মুজাহিদ
		মারুফ হাসান
প্রকাশকাল	:	সেপ্টেম্বর, ২০২৪

উৎসর্গ

জুলাই- ২০২৪ আন্দোলনের সকল শহীদ, আহত ও অংশগ্রহণকারীদের।

সূচিপত্র

১. সোশ্যাল মিডিয়া থেকে রাজপথ ৭

২. আবার স্বাধীনতার স্বাদ ! ৯

৩. অনুরণনে রক্তাক্ত জুলাই ১২

৪. সাক্ষাৎকার ১৩

৫. আগস্ট ৫, ২০২৪ : তারুণ্য ও বাংলাদেশের নবজাগরণ ১৫

৬. '২৪ এর আন্দোলন ১৮

৭. The Quota Reform Protests in Bangladesh: A Nation's Struggle for Justice and a New Independence ২০

৮. আমার চোখে ১৬ জুলাই ও স্বাধীনতা ২৩

৯. চির অম্লান জুলাই ২৬

১০. কেমন বাংলাদেশ চাই ২৮

১১. Bangladesh, I like to see ৩৩

১২. বাংলাদেশ "তুমি বিশ্বের বিস্ময়, তুমি আমার অহংকার" ৩৫

১৩. "The Role of the Student Community in State Reform" ৩৬

১৪. চীন-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর : ২৪-এর গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী উন্নয়ন, পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনের পথে নতুন বাংলাদেশ ৩৮

১৫. সংগ্রামী ২রা আগস্ট ৪০

১৬. স্থিতাবস্থার বয়ানঃ যে বয়ানে স্থিতাবস্থা বজায় থাকে ৪২

১৭. শহিদের সংখ্যা ৪৪

১৮. হিন্দু-মুসলিম বৈরিতার মনস্তত্ব ৪৬

১৯. শিক্ষক না রাজনৈতিক কর্মী ৫০

২০. বিদেশে বাংলাদেশি এম্বাসির উদাসীনতা ও গাফিলতি :

সমস্যা ও সমাধানের জন্য কিছু সুপারিশ ৫২

২১. কবিতা: নতুন স্বাধীনতার সঞ্চার ৫৪

২২. কবিতা: চব্বিশের জুলাই ৫৫

২৩. কবিতা: জালিমের বুলেটের সামনে ৫৬

২৪. Quota Reform Movement: Bangladesh's Second Independence (Timeline in Pictures) ৫৭

সম্পাদকীয়

চব্বিশের জুলাই। বাংলাদেশের ইতিহাসের দীর্ঘস্থায়ী মাস। অজস্র মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়ে তবেই ক্যালেন্ডার থেকে বিদায় হয়েছে জুলাইয়ের। হাজার হাজারজন হারিয়েছেন চোখের দৃষ্টি, শ্রবণশক্তি। হারিয়েছেন হাত, হারিয়েছেন পা। এভাবেই শত শহীদের রক্ত, হাজারের ত্যাগ-তিতীক্ষায় নতুন এক বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। এমন বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশে থাকবে না কোনো বৈষম্যের। বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন জুলাইয়ের আন্দোলনে শহীদ সকলের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছে। সাথে আহতদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

২০১৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর হতেই বিসিওয়াইএসএ চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নয়নকে সামনে রেখে চীনে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের এক সম্মিলনস্থল হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। নানান আয়োজনের মাধ্যমে প্রস্তুত করছে বাংলাদেশের নিমিত্তে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাবে এমন একটি ওয়ার্কফোর্স। একটি ছাত্রসংগঠন হিসেবে আমরা গর্বিত বাংলাদেশের বিনির্মাণে অংশ নিতে পেরে।

বিসিওয়াইএসএ'র ষাণ্মাসিক ম্যাগাজিন 'মহাপ্রাচীর'-এর এবারের থিম 'জুলাই ২৪ : তারুণ্য ও নতুন বাংলাদেশ'। জুলাই'২৪ এর আন্দলোনের প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে এর প্রতিটি চিত্রপট তুলে ধরার চেষ্টা করেছি আমরা। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গুণী শিক্ষকবৃন্দ লিখেছেন এ সংখ্যায়। লিখেছেন নানান স্কলারবৃন্দ। গবেষকবৃন্দ ও শিক্ষার্থীগণ। আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরার পাশাপাশি 'কেমন বাংলাদেশ দেখতে চাই' শিরোনামে বাংলাদেশকে ঘিরে বোনা স্বপ্ন তুলে ধরা হয়েছে। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ এসবের সঙ্গে মিলিয়ে নিজেদের স্বপ্নকেও সাজাতে পারবেন। আর আন্দোলনের ইতিহাস ঐতিহ্য সামনে রেখে বাংলাদেশ বিনির্মাণে অংশ নেবেন।

ইতিহাস ও স্বপ্ন তুলে ধরা অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ কাজ। বাংলাদেশের বীর সেনানীদের চিরভাস্বর করে রাখতে যারা এই গুরুদায়িত্বে অংশ নিয়েছেন সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা। এ কাজ করতে যেয়ে অনেক ভুলত্রুটি হতে পারে। যেকোনো ভুলত্রুটি সম্মানিত পাঠবৃন্দকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ। ম্যাগাজিনের লেখা ও চিন্তার দায়ভার একান্তই লেখকদের। এসবের কপিরাইটও তাদেরই।

আমাদের শহীদদের স্মৃতি চিরঅমলিন হোক। বিসিওয়াইএসএ বিশ্বাস করে, তাদের ত্যাগ বিফলে যাবে না। চলুন, শহীদদের স্মৃতিকে সামনে রেখে, দৃঢ়প্রত্যয়ে সবাই নতুন বাংলাদেশ নববিনির্মাণে অংশগ্রহণ করি। এই কামনায়।

২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

নানজিং বিশ্ববিদ্যালয়, নানজিং, চীন।

এ বি সিদ্দিক

সম্পাদক, মহাপ্রাচীর

সভাপতি, বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (বিসিওয়াইএসএ)

সোশ্যাল মিডিয়া থেকে রাজপথ

ছবি: দ্যা হিল

জুলাই '২৪ বাংলাদেশের ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। কোটা সংস্কার আন্দোলনে সরকারের দমন-পীড়ন নীতিতে ছাত্রদের যে প্রাণ নিল, সেই বিক্ষোভ প্রথমে রাষ্ট্রসংস্কার, পরবর্তী সময়ে এক দফা আন্দোলনে ফ্যাসিস্ট রিজিমের পতন হয়। সংবাদ মাধ্যমের সূত্র অনুযায়ী জানা যায়, প্রায় আট শতাধিক ছাত্র, জনসাধারণের মৃত্যু হয়, ছয় শ-এরও বেশি অন্ধ হয়েছেন; দশ হাজারের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। এই রক্তক্ষয়ী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছে বাংলাদেশে তরুণ প্রজন্ম। পুরো আন্দোলনটিতে তরুণরাই ছিল সোচ্চার। যেখানে অন্যান্য পেশাজীবীসহ সাধারণ মানুষ বেশ কিছুদিন যাবৎ ফ্যাসিস্ট রিজিমের বিপক্ষে কথা বলতে পারেনি, সেখান ছাত্রদের এই অসীম সাহস ও তীব্র ক্ষোভ খোদ সরকার আন্দাজ করতে পারেনি। অনেকেই এই আন্দোলনকে বিপ্লব বলছেন আবার অনেকেই মনে করেন, এটি গণ অভ্যুত্থান। সে বিতর্ক যা-ই হোক, সবকিছুর মূলে যে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্ম রয়েছে, তা নিয়ে কোনো দ্বিমত নেই।

বলা হয়ে থাকে, তরুণরাই দেশের ভবিষ্যৎ আর তারাই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশ যেখানে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালের আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে তরুণদের ভূমিকায় ছিল মুখ্য। সে জায়গা থেকে তরুণদের ভূমিকা দেশের ইতিহাসে বরাবরই ছিল। কিছু ক্ষেত্রে সেগুলো নেতিবাচক থাকলেও পুরোটা সময় ছিল ইতিবাচক। সেই জায়গা থেকে এই প্রজন্মের কাছে মানুষের কিছু অভিযোগ ছিল, ছিল আবদার আর প্রত্যাশা। এই প্রজন্মের তরুণেরা দেশ নিয়ে ভাবে না। তাদের স্বপ্নই বিদেশে চলে যাওয়া। তারা দেশের ইতিহাস পড়ে না। তারা রাজনীতি-সচেতন না। তারা আছে তাদের মোবাইল ফোন আর তাদের নয়া প্রযুক্তির দুনিয়ায়। সেই অভিযোগগুলোকে তরুণেরা যে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারত, তাও নয়। কিন্তু সেই সমস্যার কারণ কি শুধু তরুণদের ছিল? না। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে বয়স না হলে তারা কিছু বোঝে না, সেই বিষয়টির খুবই চল আছে। তরুণদের চিন্তাভাবনা বোঝার ও গুরুত্ব দেওয়ার ভাবনা আমাদের সমাজের নেই বা ছিল না। একটা পুরো দেশের সিস্টেমে তরুণরা উপেক্ষিত ছিল; সাথে যারা রাজনীতিতে আগ্রহী ছিল, তাদের হতে হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলোর হাতিয়ার। আদর্শ বাদ দিয়ে তারা হয়ে উঠেছে প্রভুভক্ত ফলোয়ার। সেই জায়গা থেকে দেশের তরুণদের দেশের প্রতি ভাবনা, রাজনীতির আগ্রহ দিনকে দিন কমে আসছিল। দেশের যেই শিক্ষাব্যবস্থা, তা ছিল তরুণদের পিছিয়ে দেওয়ার প্রধান

অস্ত্র। বিশ্বের চেয়ে সাথে তাদের হীনম্মন্যতা বাড়ানোর। এই গ্লানি বাংলাদেশের তরুণদের অনুৎসাহিত করেছে দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবার। তারা অনুৎসাহিত হতো তাই বলে, তারা কখনোই থেমে ছিল না। আবিষ্কার, প্রতিযোগিতা কথা কিংবা দেশের প্রতিনিধিত্ব করা বহির্বিশ্বে সেটা বরাবরই দেশের তরুণরা করেছে। সামসময়িক কালে দেশের একটা বিশাল বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে ফ্রিল্যান্সার তরুণদের ভূমিকা অন্যান্য। আমাদের দেশের জনগণের সংখ্যায় তরুণদের যেই অনুপাত, সেই জায়গা থেকে সম্ভাব্য যেই গুরুত্ব তরুণদের পাওয়ার কথা ছিল তা কখনোই দেওয়া হয়নি।

এত প্রতিকূলতার পরেও কথা কীভাবে তরুণরা মাঠে নেমে আসল? সুকান্তের ভাষায় বলতে হয়, "আঠারো মানে না বাধা।" দেশের চলমান, শোষণ সাথে বিশাল শিক্ষিত তরুণদের বেকারত্ব আর কোটাব্যবস্থা তরুণদের ক্ষোভের জন্যই যথেষ্ট ছিল। ২০১৮ সালে একই রকম আন্দোলনে যখন কোটাব্যবস্থা বাতিল হয়; কিন্তু ঠিকই ২০২৪ সালে হাইকোর্ট আবারও সেই ব্যবস্থা বহাল করে, তখন এ দেশের ছাত্রদের হাতে অন্য কোনো উপায় ছিল না। রাজপথ দখল করে চলে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন। সেই আন্দোলনে সরকার নির্বিচারে প্রথমে তাদের পেটোয়া বাহিনী, পরবর্তী সময়ে পুলিশের মাধ্যমে নির্বিচারে লাঠি পেঠা আর হত্যা করে। করে গুরতর মানবাধিকার লঙ্ঘন। সেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে এ দেশের তরুণ প্রজন্ম। রাজপথে গুলি খেয়ে তারা এই আন্দোলনকে সবার করে দিয়েছে। তারুণ্যের উদ্দীপনা আর আন্দোলন সংক্রামক। সেটা কীভাবে দেশে বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, তা কল্পনাতীত।

যেই তরুণরা দেশের জন্য ভাবে না, তারাই দেশের সংস্কারে আন্দোলনে নামে। রাজপথে গুলি খেয়ে শহিদ হয়েছে। মৃত্যুভয় উপেক্ষা করে নামে রাজপথে। ভিডিও, ছবি তুলে ফ্যাসিস্ট রিজিমের কালো কাজ তুলে ধরে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা ঘেরাও করে সে দেশগুলোর দূতাবাস আর তাদের সাথে যুক্ত হয় বাংলাদেশের জণগণ। তারুণ্যের এই শক্তি আর প্রবল দাবদাহে নস্যাৎ হয়ে যায় ফ্যাসিবাদ। তাদের দেশের মানুষের দাবি মেনে নিতে হয়। ছাড়তে হয় দেশ। আন্দোলনের সময় দেশ গড়তে বিদেশে অবস্থিত তরুণদের যেই প্রত্যয়, প্রতিশ্রুতি আর সোচ্চার ভূমিকা ছিল, তারও গুরুত্ব ছিল অনেক। দেশের ছাত্রদের জীবন দেওয়া, ট্যাংক তোয়াক্কা না করে রাজপথ দখলে রাখা, শত বাধায় নিজেদের লক্ষ্য অটুট থাকায় এসেছে বাংলাদেশের এই দ্বিতীয় বিজয়। বিজয়োল্লাসে মাতোয়ারা না হয়ে তরুণরাই নেমে পড়েছে রাষ্ট্র সংস্কারে। দেশকে বাঁচাতে। ট্র্যাফিক থেকে শুরু করে, রাজপথ, সরকারি স্থাপনা পরিষ্কার করা, দেওয়ালিকা, আর্ট আর গ্রাফিতিতে সাজানো, রাতের না ঘুমিয়ে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সাথে পুলিশ না থাকায় রাস্তার অলিতে গলিতে নিরাপত্তা নিশ্চিত করায় সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। নিজেদের হাতেই নিয়ে নেয় দেশ গড়ায় মহান দায়িত্ব। এই প্রজন্মের এই অবদান দেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

এখনও তরুণদের বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করতে বা করে যাবে নানা মহল। আমার বিশ্বাস কিছুতেই বাংলাদেশের তরুণরা দেশ গড়ার মহানব্রত থেকে লক্ষ্যচ্যুত হবে না। যেই সাহসী ও অদম্য বাংলাদেশের স্বপ্ন তরুণরা দেখে, তা আমাদের হবেই। এরা কিছু জানে না, বোঝে না, পাশ্চাত্যের ট্যাগ জেন জি বলে দিয়ে তাদের মহান সম্ভাবনাকে দূরে ঠেলে দিতে চাওয়া লোকদের করছি সাবধান। তরুণদের মাথায় কে বা কারা ডিম ভেজে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করবে। তারাও হয়তো বুঝতে পারছে না-এই প্রজন্ম, এই তরুণদের পক্ষে কী না করা সম্ভব। এই তরুনেরা ভয় পায় না। এই ছাত্রসমাজ মাথা নিচু করে বাঁচে না। যারা রাজপথে রক্ত দিতে জানে; তারা দেশও গড়তে জানে সকল প্রতিকূল ব্যবস্থাকে লাথি মেরে!

মঈন উদ্দিন হেলালী তৌহিদ
মাস্টার্স শিক্ষার্থী
চায়না ইউনিভার্সিটি অব পেট্রোলিয়াম বেইজিং, চীন।

আবার স্বাধীনতার স্বাদ!

ছবি: পিরিও ব্লগস

একাত্তরের সেই রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমরা অনেকেই পড়েছি, অনেকেই শুনেছি। আর এটা ভেবেছি, কতই-না নির্মম ছিল। সে সময়টিতে কতই-না তিতিক্ষার বিনিময়ে আমরা আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশ পেয়েছিলাম। যারা আমাদের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছিল, তাদের সন্মানের সাথে স্মরণ করেছি, তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি সব সময়।

যাদের '৭১-এর পরে জন্ম, তারা কখনো অনুভব করতে পারিনি–পরাধীনতার কষ্ট কেমন ছিল, অনুভব করতে পারিনি সেই শক্তি–যা প্রতিটি মানুষকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে বাধ্য করেছিল, অনুভব করতে পারিনি, মানুষ নিজের আদরের ভাই-বোনদের রেখে, নিজের সন্তান বা পরিবারের মানুষদেরকে রেখে কীভাবেই-বা নিজের জীবনকে বাজি রেখে অন্যায়ের প্রতিবাদে নেমে গিয়েছিল। আসলে আমরা অনেকেই বুঝতে পারিনি, তারা '৭১-এর অনেক আগেই যুদ্ধ শুরু করেছিল, তারা কইত-না প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে দেশকে ও নিজের বাঁচাতে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করেছিল, আমরা বুঝতে পারিনি তারা কোন আশায় বা কোন মনোবলে বা শক্তিতে উদ্দীপ্ত হয়ে নিজের জীবনকে বাজি রেখেছিল তাদের পরবর্তী জাতি বা পরবর্তী সকল প্রজন্মের জন্য। তাদের এই ত্যাগ, তাদের এই বলিদান, তাদের রক্ত, আমাদেরকে দিয়েছিল একটি স্বাধীন দেশ, যার নাম "বাংলাদেশ"।

কিন্তু স্বাধীনতার পরে, কয়েক যুগের পর, আমাদেরই মানুষ, আমাদের মাঝের এক গোষ্ঠী, অন্য সকল মানুষকে নিজের দাস হিসেবে পরিণত করার জন্য, নিজের কথার কাঠ-তল হিসেবে পরিণত করার জন্য নেমে পড়েছিল। আমরাুপ প্রশ্ন !আস্তে বুঝতে শুরু করলাম পরাধীনতা কি -আস্তে আবার কি !করতে শুরু করলাম এই কি স্বাধীন বাংলাদেশ আবার পরাধীন হয়ে গেলাম!

কারণ, সেই আগের ইতিহাসগুলো কেন যেন এক এক করে মিলে যাচ্ছিল বর্তমান পরিস্থিতির সাথে। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না ন্যায়বিচার, খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না মানুষের অধিকার, পাওয়া যাচ্ছিল না যোগ্যতার সঠিক মূল্য, পাওয়া যাচ্ছিল না মানুষের কথা বলার ন্যূনতম স্বাধীনতা, পাওয়া যাচ্ছিল না মানুষের মত প্রকাশ করার জন্য একটি মাধ্যম সবাই যেন একটি গোষ্ঠীর মতের সাথে তাল ! মিলিয়েই সব কাজ করতে পছন্দ করত, আর, হ্যাঁ যারাই ! তার বিরুদ্ধে যেত, তাদেরকেই অন্যায়ভাবে আইন প্রয়োগ করে নি শাস্তি দেওয়া নিষ্ঠুর-হত। এ এক নির্মম পরাধীনতা যেটা ছিল আমাদেরই মানুষের তৈরি যারা ! নিজের স্বার্থ হাসিল করার জন্য, নিজের ক্রোধ, নিজের হিংসা বা নিজের সকল উচ্চ বিলাস কে অগ্রাধিকার দিয়ে- সাধারণ মানুষকে নির্যাতন করেছে।

আমাদের এই পরাধীন জাতিতে আবার স্বাধীনতার শক্তিতে জাগ্রত করতে, আমাদের বাংলার সোনালি সন্তানরা আমাদের সবার আশার প্রদীপ হয়ে দাঁড়াল, এলো '২৪-এর গণ অভ্যুত্থান। এই নতুন যুদ্ধের সময়টুকু অনেক ভিন্ন ছিল, যারা যে যেভাবেই পেরেছে, অংশগ্রহণ করেছে। এই যুদ্ধটি শুধু শারীরিকভাবে করা হয়নি, এই যুদ্ধটি শুধু রাজপথে করা হয়নি, এই যুদ্ধটি শুধু অফিস-আদালতে মানুষের মাঝে করা হয়নি, এই যুদ্ধটি করা হয়নি কোনো অস্ত্র দিয়ে। এই যুদ্ধটি করা হয়েছে সকল মানুষের নিজের সাথে, নিজেকে পরাধীনতার শিকল থেকে নিজের দেশের মানুষের কাছে থেকে মুক্ত করতে। সেই মানুষ, যার সাথে সে একদিন আগেও হয়তো একসাথে বসে আড্ডা দিয়েছে, সেই মানুষটির বিপদেও রাত জেগেছে। সেই মানুষ, যার সাথে একসাথে এক বেঞ্চে বসে স্কুলের বা কলেজের বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্দর সময়গুলো কাটিয়েছে, সেই মানুষ যার জন্য সে নিজের জীবনকেও বাজি রেখেছে অনেক বার। আজ সেই মানুষগুলো এক গোষ্ঠীর কাছে নিজেকে বিক্রয় করে দিয়েছে, সে গোষ্ঠীর ঘৃণ্য ইচ্ছা, উদ্দেশ্য, বাস্তবায়ন করার জন্য নিজের বন্ধুকে নিজের দেশকে, নিজের দেশের মানুষকে ভুলে গিয়েছে, এই সকল মানুষের বিরুদ্ধেই সবাইকে যুদ্ধ করতে হয়েছে অনেক দিন আগে থেকেই। এই যুদ্ধটি হয়েছে মায়ের ভালোবাসার ছোট সন্তানের হাত ধরে, এই যুদ্ধটি হয়েছে বাবার হাত ধরে দু-বছরের শিশুর হাত ধরে রাজপথে নামার মাধ্যমে, এই যুদ্ধটি হয়েছে ছোট্ট বাচ্চার হাতে রাজপথে মানুষকে পানি পান করার মাধ্যমে। মায়ের কাছে সোনার ছেলের বলে যাওয়া, "বাকি ভাত ফিরে এসে খাব", "আজ আমি ফিরতে না পারিলে ভেবে নিয়ো শহিদ হয়ে গিয়েছি"। এই যুদ্ধটিতে শহিদ হয়েছে নাম না জানা অসংখ্য মানুষ, যারা কি না বুঝতেই পারেনি, তার স্বজাতি ভাইয়েরা, তার বুকে, তারই টাকায় কেনা গুলি ছুড়তে পারবে !তাকে আঘাত করে রক্তাত করে পারবে ! এই যুদ্ধটিতে সকল স্তরের মানুষ রাজপথে প্রতিবাদ করেছে সেই নিকৃষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, যারা ভাবত দেশটি শুধু তাদের, তার পরিবারের মানুষের। তারা বাকি সবাইকে দয়া করে নাগরিকত্ব দিয়ে অবস্থান করার অনুমতি দিয়েছে।

যারা প্রবাসে ছিল তারা যেভাবেই পেরেছে নিজেদের অংশগ্রহণ অবস্থান তুলে ধরেছে। তারা যদিও জানত অন্যদেশে তারা পরাধীন, যদি নিজ দেশের সরকার একবার আদেশ করে তাহলে এই দেশে তার একমুহূর্ত থাকা সম্ভব না, তার এত বছরের কষ্ট, তার পরিবারের জন্য যে দায়িত্ব তার ওপর, সেটা কখনো সে আর পালন করতে পারবে না জুলাইয়ের সেই দিনগুলো আজও মনে পড়বে সকল !! প্রবাসীদের। সবাই বাংলাদেশের একটি সুখবর শোনার জন্য প্রতিটি ক্ষণ মুঠোফোনের পর্দায় তৃষ্ণার্ত কাকের মত চেয়ে থেকেছে, দেশের মানুষের বা পরিবারের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছে সম্ভাব্য প্রতিটি মাধ্যমে, শুধু একটি ভালো খবর পাওয়ার জন্য। যদিও বাংলাদেশের কারো সাথে কথা বলার সুযোগ হয়নি অনেক দিন, সুযোগ হয়নি প্রাণের মানুষের সাথে কথা বলার, আন্দোলনে যাওয়া ভাইয়ের সাথে, বোনের সাথে, কথা বলার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় পড়েছিল সবাই, ভেবেছিল ছোট্ট একটি বাক্য যদি শোনা যেত, প্রিয় মানুষের মুখের থেকে একবার যদি শোনা যেত, হ্যালো এই ছোট্ট বাক্যটুকু শোনার !আমি ভালো আছি ! জন্য অনেকে অনেক সময় ধরে অপেক্ষা করেছে, রাত-

দিন সকল ব্যস্ততার মাঝেও নিজেকে ঠিক রেখেছে, এই প্রত্যাশায়, আমাদের বাংলাদেশে আবার সোনালি সকাল আসবেই, আবার আমরা নিজেরা নিজেদের মাটি, নিজেদের দেশ, নিজেদের জাতিকে, নিজেদেরই সেই ঘৃণ্য গোষ্ঠীর কাছ থেকে রক্ষা করতে পারব, আবার আমরা বলতে পারব, আমাদেরও একটি দেশ আছে, যে দেশের নাম বাংলাদেশ।

আজ আমরা আমাদের সেই প্রাণের বাংলাদেশকে ফিরে পেয়েছি, আজ আমরা মুক্ত হয়েছি সকল অন্যায় অবিচারের-শিকল থেকে, আজ আমরা সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমাদের দেশকে, আমাদের জাতিকে, আমাদের সম্পদকে, আমাদের জন্য, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ব্যবহার করতে। আজ থেকে আমরা শপথ করি আমাদের দেশকে সোনালি রূপে সাজাতে সবাই একসাথে কাজ করব, আর যেন কেউ আমাদের দেশকে, আমাদের কাছে থেকে ছিনিয়ে নিতে সাহস করতে না পারে, কারণ এই নতুন বাংলাদেশ আমার, আপনার, আমাদের। সবাই আমরা এখন গর্ব করে বলতে পারি...

আজ আমাদের সবার একটি দেশ আছে', যে দেশের নাম "বাংলাদেশ" ।

ডাঃ মোঃ মনিরুজ্জামান শিহাব

পিএইচডি গবেষক, ক্যাপিটাল মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, বেইজিং, চীন।

অনুরণনে রক্তাক্ত জুলাই

আমরা যদি টাইম মেশিনে বসে কয়েক যুগ পরের কথা চিন্তা করি, তবে কেমন শিহরণ জাগাবে রক্তাক্ত জুলাই আমাদের বা নতুন প্রজন্মের কাছে? হয়তো আমাদের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে যাবে অথবা নতুন প্রজন্মের কাছে একটা রুপকথার গল্পের মতই মনে হতে পারে। ধরুন, আজ থেকে কয়েক যুগ পর আমরা বসে আছি কোন এক অডিটোরিয়াম বা বৈঠকে। সামনের দর্শক আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের এক ঝাঁক তরুন। যারা শুনতে চায় রক্তাক্ত জুলাইয়ের গল্প। তারা শুধু বই বা অনলাইন ডকুমেন্টসে দেখেছে দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের ২০২৪ সালের জুলাইয়ের কান্না, হাজার হাজার মানুষের আত্মত্যাগ বা কোটি কোটি মানুষের আহাজারি। কিন্ত আদৌও কি তারা অনুধাবন করতে পারবে কি ঘটেছিল বাংলাদেশসহ পুরো পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা মিলিয়ন মিলিয়ন বাংলাদেশীর অন্তরের তখনকার অবস্থা? পুরো জাতি বৈষম্য দূরীকরণে তৃষ্ণায় কতটা কাতর ছিলো?

৫০ বছরের মধ্যবয়সী একটা দেশের সব মত-পথের মানুষ এক সুতায় মিশে গিয়েছিলো। বৈষম্য ঘুছাতে ছাত্রদের ছোট্ট কিন্ত অত্যাধিক প্রয়োজনীয় একটা আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ থেকে একটা জাতি কিভাবে নতুন করে দেশের ইতিহাস তৈরি করেছিলো তা পৃথিবীতে ছিলো বিরল। নতুন ইতিহাসকে তৈরি করতে কালো পিচ ঢালা রাস্তায় লাল রক্তের যে স্রোত তৈরি করেছিলো ছাত্র-জনতা, তা যুগযুগ ধরে মুক্তিকামী মানুষকে পথ দেখাবে। ২০২৪ সালের ১৬ই জুলাই আবু সাঈদ যদি সাহসের বাতিকে না জ্বালাতো হয়তো গল্পটা অন্যরকম হতে পারতো। সাঈদের রক্ত পুরো দেশের মানুষকে উজ্জীবিত করেছিলো। কাতারে কাতারে, লাইনে লাইনে মানুষ দাঁড়িয়ে গিয়েছিলো নতুন যুগ তৈরি করতে। ১৭ এবং ১৮ জুলাই প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির ছাত্ররা যখন রাজপথে নেমে এসেছিলো তখন জুলাই আন্দোলনের মোড় পুরোটা ঘুরে যায়। একে একে ঢাকার রাজপথে আবাবিল হয়ে নেমে আসে ছাত্র-জনতা। যাত্রাবাড়ী, উত্তরা, মোহাম্মদপুর,বাড্ডা এরিয়াতে নেমে এসেছিলো একঝাঁক মুক্তির দূত। যারা জানতো শুধু সামনে এগিয়ে চলা। নেই কোন ভয় বা পিছুটান। তাদের ত্যাগের মহিমায় আমাদের নতুন আরেকটা ইতিহাসের যে সৃষ্টি তা ইতিহাসে অম্লান হয়ে থাকবে। ২৫ দিনের আন্দোলন যে একটা জাতির জন্য আশীর্বাদ হয়ে আসতে পারে তা জুলাই মাস দেখিয়ে দিয়েছে। জুলাইয়ের ত্যাগ বাংলাদেশীদের জন্য অনন্তকাল ধরে জাগ্রত রবে স্বমহিমায়।

জান্নাতুল আরিফ

পিএইচডি গবেষক, নর্থ চায়না ইলেকট্রিক পাওয়ার ইউনিভার্সিটি, বেইজিং, চায়না।

সাক্ষাৎকার-১

বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের যে কয়েকটি ছবি পুরো বিশ্ববাসীর মনে গেঁথে থাকবে তার মধ্যে একটি ছিলো বাংলাদেশের জার্সি পরিহিত ১৭ বছরের কিশোর **হাসনাতুল ইসলাম ফাইয়াজ**কে দুইহাতে দড়ি বেঁধে আদালতে হাজির করার ছবিটি। এই বিশেষ সংখ্যায় ফাইয়াজ ভাইয়া সাক্ষাৎকার দিয়েছেন মহাপ্রাচীর টিমকে।

প্রশ্ন: আপনি কেমন আছেন? আপনার স্কুল ও পড়াশোনার অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু বলুন।

উত্তর: আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি। বর্তমানে আমি ঢাকা কলেজে ইন্টারমিডিয়েট ফার্স্ট ইয়ার-এ পড়াশোনা করছি। এর আগে আমি শামসুল হক খান কলেজ থেকে এসএসসি সম্পন্ন করেছি। আমি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক বোধ করছি কারণ আমার কলেজের শিক্ষক এবং সহপাঠীরা যথেষ্ট সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব নিয়ে আমাকে এগিয়ে যেতে সহায়তা করছে। তারা বিভিন্নভাবে আমাকে সাহায্য করছে, যা আমাকে মানসিকভাবে অনেক শক্তি জোগাচ্ছে।

প্রশ্ন: আপনার পছন্দের খেলা কী? অবসর সময়ে কী করতে ভালোবাসেন?

উত্তর: ছোটবেলা থেকেই আমার ক্রিকেট খেলা দেখতে ও খেলতে বেশ ভালো লাগে। ফুটবলও আমার পছন্দের, তবে ক্রিকেট খেলার প্রতি আমার ঝোঁক একটু বেশি। আমার বাসায় বেশ কিছু ক্রিকেট ট্রফি রয়েছে যা আমি সাজিয়ে রেখেছি। এছাড়া অবসর সময়ে আমি বই পড়তে ভালোবাসি। আমার লিভিং রুমেই একটি ছোট্ট লাইব্রেরি আছে যেখানে আমি আরাম করে বিভিন্ন বই পড়তে পারি।

প্রশ্ন: আন্দোলন সম্পর্কে প্রথম কিভাবে জানলেন? নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারেন?

উত্তর: আমি সোশ্যাল মিডিয়া এবং টেলিভিশন থেকে প্রথম আন্দোলনের খবর জানতে পারি। ছাত্রদের সাথে যে ঘটনা ঘটেছিল, তা দেখে আমি খুবই মর্মাহত হই। বিশেষ করে আবু সাঈদ নামের একজন ভাইকে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনা আমাকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। সেই সময় আমার বন্ধুদের সাথে এই বিষয়ে আলোচনা করতে করতে আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে, যেভাবেই সম্ভব আমরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করব। আমরা মাতুয়াইল অঞ্চলে গিয়েছিলাম এবং সেখানে কিছু সময় অবস্থান করি। আমরা দুইদিন পানি বিতরণের মাধ্যমে আন্দোলনে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি এবং আমাদের শিক্ষকরাও আমাদের সহায়তা করেছেন। কিন্তু যখন পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, তখন আমাদের নিরাপত্তার জন্য সরে আসতে হয়।

প্রশ্ন: আপনাকে গ্রেফতারের পর সারা দেশ আপনার জন্য প্রতিবাদ করেছিল। সেই সময়টা আপনি কিভাবে দেখেছেন?

উত্তর: সেই সময় আমি পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি, তাই দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব একটা জানার

সুযোগ ছিল না। গ্রেফতারের সময় আমি খুব অস্বস্তিতে ছিলাম। আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করার সুযোগও দেয়নি।

আমাকে রিমান্ড দেয়া হলে আমি শকড হই তবে নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা করি। পরবর্তী দিনই আমার রিমান্ড বাতিল করে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানো হয়। সেখানে দীর্ঘ সময় ছিলাম। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর জামিন নিয়ে বাসায় যখন ফিরছিলাম, তখন আমি জানতে পারি পুরোটা সময় সারা দেশ আমাকে সমর্থন করেছে। আমার ভাইয়ের সাথে কয়েক মিনিটের কথা বলার সময় তিনি আমাকে জানান যে আমার বিরুদ্ধে সারা দেশে আলোচনা চলেছিলো

সরকার ঘৃণ্য মামলার যাতাকলে আমাকে ফেলতে চেয়েছিলো। আমি তখন বিশ্বাসই করতে পারছিলাম না যে আমাকে এতদিন এত ঘৃণ্য কাজের সাথে জড়িত করে অন্যায় করা হচ্ছিলো। তবে আমি যখন শুনি, দেশের ক্রিকেটের কেউ আমার পক্ষে কথা বলেনি, তখন সত্যিই আমি খুব খারাপ অনুভব করি। আমার ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসার ফলশ্রুতিতে এই আন্দোলন নিয়ে তাদের নীরবতা আমাকে মর্মাহত করে।

প্রশ্ন: আন্দোলনে আপনার প্রেরণা কী ছিল?

উত্তর: আমার আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার পেছনে সবচেয়ে বড় প্রেরণা ছিল শহীদ আবু সাঈদ ভাই। তিনি জীবনের মায়া ত্যাগ করে যে সাহসিকতা দেখিয়েছেন, তা আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। এছাড়া অনেক শিক্ষার্থী ভাইবোনদের ত্যাগ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই আমাকে আরও বেশি উৎসাহিত করেছে।

প্রশ্ন: আন্দোলন সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কী? আপনি ভবিষ্যতে বাংলাদেশ নিয়ে কী ভাবছেন?

উত্তর: এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং সবার ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করা। আমি মনে করি, শহীদদের ত্যাগের প্রতি সম্মান জানিয়ে আমাদের একটি বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলা উচিত। ভবিষ্যতে, আমি আমার মেধা এবং দক্ষতা দিয়ে মানুষের অধিকার আদায় এবং দেশকে গড়ার জন্য কাজ করতে চাই।

প্রশ্ন: ক্ষুদিরামের মত অন্যান্য সাহসী ব্যক্তিত্বদের সাথে আপনার তুলনা করা হচ্ছে। আপনি এটি কিভাবে দেখছেন?

উত্তর: এ ধরনের তুলনা আমার জন্য বিরাট সম্মানের, কিন্তু আমি মনে করি আমার অবদান এই আন্দোলনে জীবন বিলিয়ে দেয়া এবং আহত পঙ্গুত্ব ও চোখ হারানো সবার তুলনায় নগণ্য। তারা জীবন উৎসর্গ করে দেশের জন্য যা করেছেন, তা সত্যিই অসাধারণ। আমি যতটুকু পেরেছি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমি জানি আমার কৃতিত্ব খুবই নগণ্য। আমি ভবিষ্যতে সমাজের কল্যাণে কাজ করার প্রতিজ্ঞা করছি এবং যতটা সম্ভব মানুষের জন্য কাজ করে যেতে চাই।

প্রশ্ন: আপনি যদি সরকার প্রধান হতেন, তাহলে কোন বিষয়গুলো ঠিক করতে চাইতেন?

উত্তর: আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা একজন প্রকৌশলী হওয়া এবং আমার জ্ঞান দিয়ে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখা। আমি চাই, বাংলাদেশের উন্নয়নে আমার জায়গা থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে এবং বৈষম্যহীন একটি দেশ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখতে।

প্রশ্ন: দেশের বাইরে যারা থাকেন, তাদের জন্য আপনার কোনো বার্তা আছে?

উত্তর: প্রবাসীরা আন্দোলনের সময় দেশের জন্য অনেক বড় অবদান রেখেছেন। তাদের সমর্থন আন্তর্জাতিক মহলে বাংলাদেশের পক্ষে চাপ তৈরি করতে সাহায্য করেছে। প্রবাসে থাকা মানুষদের প্রতি আমার বার্তা হলো, দেশের উন্নয়নে তাদের অবদান অমূল্য। আমি চাই তারা সবসময় দেশের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও সমর্থন অব্যাহত রাখুক।

আগস্ট ৫, ২০২৪ : তারুণ্য ও বাংলাদেশের নবজাগরণ

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট, একটি তারিখ যা বাংলাদেশের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু হওয়া এই বিপ্লব, যার ফলস্বরূপ আমাদের দেশের স্বৈরাচারী শাসনের অবসান ঘটে, তা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। আমি বর্তমানে চীনের শিয়ান জিয়াতং ইউনিভার্সিটিতে একজন ডক্টরাল শিক্ষার্থী হিসেবে অধ্যয়নরত। শিয়ান, চীনের শানসি প্রদেশে অবস্থিত একটি হাজার বছরের পুরনো শহর, যা চীনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট শী জিনপিং-এর পূর্বপুরুষদের নিবাস হিসেবে পরিচিত। এখানে আমি "বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (BCYSA)"-এর একজন ক্যাম্পাস অ্যাম্বাসেডর হিসেবে কাজ করছি। BCYSA একটি অরাজনৈতিক প্ল্যাটফরম যা বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষামূলক বিনিময়ের সুযোগ তৈরি করে এবং বাংলাদেশি ছাত্রদের কল্যাণে কাজ করে।

এই আন্দোলনের প্রতিটি মুহূর্ত আমি গভীর উদ্বেগ ও আকাঙ্ক্ষায় পর্যবেক্ষণ করেছি। প্রবাসে থাকলেও, আমার মন সব সময় আমার প্রিয় বাংলাদেশে ছিল। আমার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং দেশের মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে আমি ক্রমাগত উদ্বিগ্ন ছিলাম। আমার প্রিয় বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া এই ঘটনাগুলো শুধু আমাকে নয়, বরং আমাদের দেশের প্রতিটি প্রবাসী বাংলাদেশিকেও নাড়া দিয়েছে। দেশের প্রতিটি কোণ থেকে আসা খবর, বিশেষ করে শিয়ানের মতো ঐতিহ্যবাহী শহরে বসে, আমাকে সারাক্ষণ আন্দোলনের সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত রেখেছিল। শিয়ান জিয়াতং ইউনিভার্সিটির মতো এমন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত থাকলেও আমার হৃদয় সব সময় বাংলাদেশের প্রতিটি ঘটনাবলির সঙ্গে স্পন্দিত হয়েছে।

জুলাই মাসের শেষের দিকে যখন ছাত্ররা রাস্তায় নেমে আসে, তখন আমি বুঝতে পারি যে, এটি কোনো সাধারণ আন্দোলন নয়। এটি ছিল আমাদের তারুণ্যের একটি দাবিদার প্রতীক। বৈষম্যের বিরুদ্ধে ছাত্রদের এই আওয়াজ দেশের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে যায়। তারা শুধু কোটাব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি, বরং দেশের দুর্নীতি, বেকারত্ব ও রাজনৈতিক দমন-পীড়নের বিরুদ্ধেও সোচ্চার ছিল। যখন আগস্ট মাসের ৫ তারিখে এই আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ নেয় এবং শেখ হাসিনার শাসনের পতন ঘটে, তখন আমি চীনে থেকে অনুভব করেছিলাম, যেন আমার হৃদয় আমার দেশের সাথে ছিল।

আন্দোলন চলাকালীন, আমি "বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (BCYSA)"-এর উদ্যোগে প্রকাশিত একটি স্মারক পত্রের অংশ ছিলাম, যা ১৯ জুলাই বের হয়েছিল। আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের সম্মানিত প্রেসিডেন্ট এ বি সিদ্দিক এবং জেনেরাল সেক্রেটারি মোঃ জান্নাতুল আরিফ ভাই-এর সিগনেচারসংবলিত এই স্মারক পত্রটি আন্দোলনের প্রতি আমাদের সংহতি প্রকাশ করে এবং এটি অত্যন্ত প্রশংসার দাবিদার। আমি নিজে ওই স্মারকটি আমার ফেসবুক টাইমলাইনে সংরক্ষণ করি, যা আমার এই আন্দোলনের প্রতি গভীর সমর্থন ও অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

প্রবাসে অবস্থান করেও, আমি এই আন্দোলনের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকার জন্য সোশ্যাল মিডিয়াতে জোরালো ভূমিকা পালন করেছি। Facebook, Twitter, এবং Instagram-এর মতো প্ল্যাটফরমগুলোতে আমি প্রতিনিয়ত

আন্দোলনের খবর প্রচার করেছি, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশের আহ্বান জানিয়েছি। আমি শুধু নিজেই অংশগ্রহণ করিনি; বরং অন্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করেছি যে, তারা তাদের কণ্ঠস্বর তুলুক, আন্দোলনের সাথে সংহতি প্রকাশ করুক।

WhatsApp এবং WeChat এর বিভিন্ন স্টুডেন্ট ও প্রফেশনাল গ্রুপগুলিতে আমার ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি বিভিন্ন গ্রুপে আন্দোলনের সর্বশেষ খবর পৌঁছে দিয়েছি, সদস্যদের সাথে আলোচনা করেছি, এবং কীভাবে প্রবাস থেকে আমরা আন্দোলনের পাশে দাঁড়াতে পারি তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছি। বিশেষ করে, চীনে অবস্থানরত বাংলাদেশি ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রফেশনালদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে এবং আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকতে আমি সক্রিয়ভাবে কাজ করেছি।

আমি আমার পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিলাম। ঢাকায় ঘটে যাওয়া সহিংসতার মাঝে তারা কি নিরাপদ? এই প্রশ্নগুলো আমাকে রাত জাগিয়ে রেখেছে। আমি নিয়মিত তাদের সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেছি, যদিও ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের কারণে তা অনেক সময় সম্ভব ছিল না। দেশের খবর জানার জন্য আমি আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমের ওপর নির্ভর করতাম, কিন্তু তারপরও মনে হতো, আমি আমার দেশের কাছাকাছি থাকতে পারছি না।

এই আন্দোলনের সাথে যুক্ত থাকতে না পারলেও, প্রবাস থেকে আমি আমার সাধ্যমতো সমর্থন দিয়েছি। আমার চীনা বন্ধুদের কাছে আমি আমাদের দেশের পরিস্থিতি বোঝানোর চেষ্টা করেছি। তারা যখন বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে জানতে চেয়েছিল, আমি গর্বের সাথে আমাদের তরুণদের সাহসিকতার কথা বলেছি। আমি চেয়েছিলাম যে, আমার আশেপাশের মানুষরা জানুক, বাংলাদেশ এখন আর আগের মতো নয়। এই তারুণ্যই আমাদের নতুন বাংলাদেশের রূপকার।

স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা যখন দেশ থেকে পালিয়ে গেলেন, তখন আমি সৃষ্টিকর্তার কাছে সুক্রিয়া আদায় করেছিলাম। কারণ, আমি আরও প্রাণহানির আশঙ্কায় ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলাম। কিন্তু তাঁর পালানোর খবর পাওয়ার পর, আমার মধ্যে এক অভূতপূর্ব আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। সেই আনন্দের মুহূর্তে, আমার অন্যান্য ভাই ও বন্ধুদের নিয়ে আমরা "Hasina Fled" লেখা কেক কেটে উদ্যাপন করেছি। যদিও জানি না, এই কাজটি কতটুকু ভালো বা মন্দ হয়েছে, তবুও সেই মুহূর্তে এটি আমাদের বিজয়ের প্রতীক হয়ে উঠেছিল। আমরা অনুভব করেছিলাম, যেন দেশের জন্য এক নতুন দিনের সূচনা হয়েছে।

স্বৈরাচারী সরকারের পতনের আন্দোলনের রূপকার ছিলেন সাধারণ ছাত্রসমাজ এবং দেশের সাধারণ জনতা। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলে স্বৈরাচারের অবসান হয়েছে, এবং এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে। এই সরকার নিঃসন্দেহে নির্দলীয় এবং আমি তাঁদের মনেপ্রাণে সমর্থন করি। দেশের এবং সমাজের বাছাইকৃত ব্যক্তিবর্গই এই সরকারে দায়িত্ব পালন করছেন, এবং আমরা তাঁদের প্রতি আস্থা রাখছি। এই অর্জন আমরা কোনো রাজনৈতিক দলকে দিতে চাই না, কারণ রাজনৈতিক দলগুলোও তাঁদের স্বার্থ নিয়ে সচেষ্ট। আপাতত, তাঁদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত এই ভেবে যে তাঁরা স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকারের জুলুম-নির্যাতনের হাত থেকে নিস্তার পেয়েছেন এবং ন্যায়বিচার পাওয়ার আশা করছেন। অথচ দেশের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। আমরা চাই, এই নির্দলীয় সরকারই দীর্ঘদিন ধরে দেশ চালাক এবং আমাদের দেশকে নতুন পথে নিয়ে যাক।

আজ, যখন আমরা "বাংলাদেশ-চায়না ইয়ুথ স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন"-এর বিশেষ সংখ্যার জন্য এই লিখাটি তৈরি করছি, আমি ভাবছি, কতটা পথ আমরা পাড়ি দিয়েছি। ৫ আগস্টের সেই আন্দোলন শুধু একটি সরকারের পতন ঘটায়নি; বরং আমাদের তারুণ্যের শক্তি, সাহস ও ঐক্যের এক উজ্জ্বল উদাহরণ স্থাপন করেছে। একজন প্রবাসী হিসেবে, আমি এই বিপ্লবের প্রত্যক্ষ অংশীদার হতে না পারলেও, আমার হৃদয়, আমার চিন্তা সব সময় আমার দেশের সাথে ছিল এবং থাকবে। আমি বিশ্বাস করি, প্রবাসী বাংলাদেশি হিসেবে আমার অবদান এবং সংহতি বাংলাদেশের এই নবজাগরণে একটি ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

মো: আবু কাউসার
পিএইচডি গবেষক
শিয়ান জিয়াওথং ইউনিভার্সিটি, চায়না।

'২৪ এর আন্দোলন

ছবি: সিএনএন

২০২৪ সালের সেই গ্রীষ্মের দিনগুলোতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেন এক উত্তপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো ছিল, যে কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে প্রস্তুত। পুরো দেশজুড়ে মানুষের মাঝে ছিল এক নতুন আলোর ঝলকানি, এক পরিবর্তনের অঙ্গীকার। ছাত্র আন্দোলন হিসেবে যে প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল, তা তখন আর শুধু ছাত্রদের আন্দোলন ছিল না। এটি পরিণত হয়েছিল এক জাতীয় আন্দোলনে, যেখানে সাধারণ মানুষও নিজেদের দাবি নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে।

জুলাই মাসের প্রথম দিকের কথা, যখন ছাত্ররা মুক্তিযোদ্ধা কোটা সংস্কারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে একত্রিত হয়। তাদের হৃদয়ে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শ এবং তাদের কণ্ঠে ছিল ন্যায়বিচারের দাবি। কিন্তু সরকারের অমানবিক ও স্বৈরাচারী আচরণ ক্রমশ এই আন্দোলনকে জ্বালিয়ে তোলে। প্রথমে পুলিশ, পরে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় থাকা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনকারীদের ওপর আক্রমণ শুরু করে। এর পরিণতি ছিল রক্তাক্ত—পুলিশের গুলিতে আবু সাঈদ নামের এক তরুণ শিক্ষার্থী শহিদ হন।

আবু সাঈদের মৃত্যু ছিল মর্মান্তিক, একদম অপ্রত্যাশিত। তার রক্তে মাটি সিক্ত হলো, আর সেই মাটি যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। আবু সাঈদ ছিলেন আন্দোলনের প্রথম শহিদ, যার রক্তের সাথে মুগ্ধ ও অন্যান্য শহিদদের আত্মত্যাগ মিশে সারা দেশে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথেই পুরো দেশ যেন বিস্ফোরিত হলো, উত্তাল হয়ে উঠল কোটি মানুষের হৃদয়।

সতেরো বছরের চাপা ক্ষোভ যেন এবার উথলে উঠল। স্বৈরাচারী সরকার এতদিন ধরে জনগণের কণ্ঠ রোধ করে রেখেছিল, কিন্তু এবার জনগণ আর নীরব থাকতে পারেনি। আবু সাঈদের মৃত্যু যেন জনগণের সহ্যসীমার শেষ প্রান্তে পৌঁছেছিল। তার রক্তের দাম চেয়ে হাজারো মানুষ রাস্তায় নেমে আসে, তাদের কণ্ঠে একটাই আওয়াজ—"এই অত্যাচারী সরকারের পতন চাই!"

প্রথম দিকে, আন্দোলনটি ছিল শান্তিপূর্ণ। মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাদের দাবি জানাচ্ছিল, কিন্তু সরকারের নির্মম নির্যাতন এবং ছাত্রলীগের হামলার কারণে প্রতিবাদ ক্রমশ হিংস্র রূপ ধারণ করে। পুরো দেশজুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে, সব স্তরের মানুষ এতে যোগ দেয়। ছাত্রদের নেতৃত্বে সাধারণ জনগণও রাস্তায় নেমে আসে, তাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থমকে যায়, শুধু একটি দাবি নিয়ে—এই স্বৈরাচারী সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরাতে হবে।

আবু সাঈদের মৃত্যুর পর, তার সহপাঠী এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীরা যে শুধু নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে তা নয়, তারা নিজেদের ভবিষ্যৎকে এই আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের ভবিষ্যতের সাথে জড়িয়ে ফেলেছিল। বিক্ষোভকারীদের হাতে ছিল তাদের শহিদ ভাইয়ের ছবি, আর তাদের হৃদয়ে ছিল প্রতিবাদী জ্বালা। "কোনো শহিদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না!"—এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে তারা অগ্রসর হয়। তারা জানত, এই লড়াই শুধু নিজেদের জন্য নয়; বরং পুরো জাতির জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য।

সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে দেখে, দেশের ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেয়, যেন আন্দোলনের খবর বাইরে ছড়িয়ে না পড়ে। কিন্তু তাতেও তারা জনগণের কণ্ঠ রোধ করতে পারেনি। আমাদের মতো প্রবাসীরা, যারা দেশের মাটি থেকে দূরে, তাদের জন্য সেই দিনগুলো ছিল এক অসহনীয় দুশ্চিন্তার সময়। যখন ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে গেল, তখন প্রিয়জনদের সাথে যোগাযোগ করা হয়ে উঠল অসম্ভব। রাতগুলো কেটেছে নিদ্রাহীন, এক অজানা আতঙ্কে। প্রবাসে থেকেও যেন আমরা ১৯৭১ সালের সেই ভয়াল দিনগুলোর স্মৃতি বয়ে বেড়াচ্ছিলাম।

আল সানি

সানডং নরমাল ইউনিভার্সিটি, চায়না।

তবুও, যখন ফোনের ওপাশ থেকে মা, বাবা বা বন্ধুদের কণ্ঠ শুনেছি, তখনই মনে একটু শান্তি পেয়েছি। কিন্তু সেই সাত দিনের নির্ঘুম রাতগুলোতে আমাদের হৃদয়ে ছিল এক অজানা ভয়, এক দমবন্ধ ভাব। দেশের মানুষ যেন এক নতুন যুদ্ধের ময়দানে নেমে পড়েছিল, তাদের সামনে ছিল এক নতুন শত্রু—স্বৈরাচার।

আবু সাঈদের রক্তে স্নাত সেই মাটিতে দাঁড়িয়ে জনগণ প্রতিজ্ঞা করে, তারা এই স্বৈরাচারকে মেনে নেবে না। তারা জানত, তাদের লড়াই যদি সফল হয়, তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বল।

যখন সরকারের জনপ্রিয়তা দিনদিন ক্ষয় হতে থাকে, তখন দেশে একটি নতুন দিনের সূচনা হয়। ৫ আগস্টের সেই ঐতিহাসিক দিনটিতে, লক্ষ লক্ষ মানুষের চাপের মুখে হাসিনা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তার পদত্যাগের সাথে সাথেই জনগণের মনে এক নতুন আশার আলো জ্বলে ওঠে। হাসিনা ভারত পালিয়ে গেলে, জনগণের মাঝে এক বিজয়ের উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলন শুধু সরকারের পতন ঘটায়নি, এটি জনগণের জন্য একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, একতাই শক্তি। স্বৈরাচারী সরকার যে কোনো রকমেই পরাজিত হবে, যদি জনগণ এক হয়ে রুখে দাঁড়ায়। প্রায় ৬৫০ (অনির্দিষ্ট) শহিদের আত্মত্যাগ সেই অন্ধকার রাতগুলো যেভাবে আলো জ্বালিয়েছিল, ঠিক সেভাবেই বাংলাদেশের প্রতিটি কোনায় আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। সেই আলো আজও প্রজ্বলিত, সেই আলোতেই আজকের বাংলাদেশ 2.0।।

The Quota Reform Protests in Bangladesh: A Nation's Struggle for Justice and a New Independence

ছবি: বিবিসি নিউজ

In recent months, Bangladesh has witnessed a significant upheaval as citizens, particularly students, took to the streets to protest against the government's quota system for public sector jobs. The movement, which began as a call for reform, quickly escalated into a broader demand for justice and accountability, culminating in a violent crackdown by the authorities.

The Origins of the Protests

The quota system in Bangladesh reserves a significant percentage of government jobs for specific groups, including freedom fighters' descendants, women, and ethnic minorities. While intended to promote inclusivity, many argue that the system has become outdated and discriminatory, limiting opportunities for the general population. On July 15, 2024, students from Dhaka University initiated a peaceful protest, demanding a reduction in the quota allocation.

Escalation and Government Response

The peaceful protests were met with violent resistance. Reports indicate that individuals armed with rods, sticks, and even firearms, believed to be affiliated with the ruling Awami League's student wing, Bangladesh Chhatra League (BCL), attacked the demonstrators. The situation deteriorated further when police used tear gas and batons to disperse the

crowds, leading to numerous injuries and fatalities.

One of the most tragic incidents occurred on July 16, when Abu Sayed, a student at Begum Rokeya University, was shot and killed by police during a protest in Rangpur. His death became a symbol of the government's heavy-handed approach and sparked outrage across the nation.

The Aftermath

The government's response to the protests was swift and severe. A communication blackout was imposed, cutting off internet access and leaving the world in the dark about the unfolding events. The Rapid Action Battalion (RAB), Border Guard Bangladesh (BGB), and the Army were deployed, and a "shoot at sight" curfew was enforced. By July 19, the death toll had risen to over 200, with thousands more injured.

International Reactions

The international community has expressed concern over the situation in Bangladesh. Human rights organizations, including Amnesty International, have condemned the government's actions and called for an end to the violence. The Diplomat highlighted the protests as a mass uprising against what many perceive as a "killer government".

Picture Credit: vocal.media/history

Voices from Bangladesh

The protests have garnered widespread support from various segments of Bangladeshi society. Many citizens view the quota system as an obstacle to meritocracy and fairness. "We are not against the quotas for marginalized groups, but the current system is too rigid and unfair," said Rafiq, a recent university graduate. "We want a system that rewards hard work and talent, not one that perpetuates inequality."

Others have criticized the government's response to the protests. "The violence and repression we have witnessed are unacceptable," said Ayesha, a student activist. "The government should listen to our demands and engage in dialogue instead of resorting to brutality."

Government Flee and New Leadership

In a dramatic turn of events, the escalating violence and public outcry forced the government to flee the country. Prime Minister Sheikh Hasina and several top officials left Bangladesh on August 5, 2024, seeking asylum in neighbouring countries. This unprecedented move left a power vacuum, which was quickly filled by a coalition of opposition parties and civil society leaders.

The new interim government, led by Dr. Muhammad Yunus, a Nobel peace prize winner and banker, economist, has pledged to address the protesters' demands and restore order. One of their first actions was to repeal the controversial quota system and initiate a comprehensive review of public sector recruitment policies.

Progress of Reforms

Since taking office, the interim government has made significant strides in addressing the issues that sparked the protests. A new merit-based recruitment system has been introduced, ensuring equal opportunities for all citizens. Additionally, the government has launched several initiatives to promote transparency and accountability in public administration.

The reforms have been met with cautious optimism by the public. "It's a step in the right direction," said Shakib, a young professional. "But we need to see these changes implemented effectively and consistently."

The Riots of August 5, 2024

The day the government fled, August 5, 2024, saw widespread riots across the country. In Dhaka, Chittagong, and other major cities, clashes between protesters and security forces resulted in significant property damage and numerous casualties. The interim government declared a state of emergency and imposed a curfew to restore order.

Despite the chaos, many citizens remained hopeful. "This is a turning point for our country," said Farhana, a teacher. "We have endured so much, but I believe we can build a better future together."

Current Situation

As of August 15, 2024, the situation in Bangladesh has stabilized significantly. The interim government has lifted the state of emergency and curfew, and life is gradually returning to normal. However, the scars of the recent violence are still visible, and the nation faces a long road to recovery.

The international community continues to monitor the situation closely. The United Nations has offered support for the ongoing reforms and called for an independent investigation into the violence that occurred during the protests.

Looking Ahead

The future of Bangladesh remains uncertain, but there is a renewed sense of hope and determination among its citizens. The recent events have highlighted the need for systemic change and the importance of listening to the voices of the people. As the nation moves forward, the lessons learned from the quota reform protests will undoubtedly shape its path towards a more just and equitable society.

In conclusion, the recent quota reform protests in Bangladesh have highlighted deep-seated issues within the country's political and social systems. The government's heavy-handed response has drawn international condemnation and galvanized a generation of young Bangladeshis determined to fight for justice and equality. As the nation grapples with these challenges, the voices of its citizens will continue to play a crucial role in shaping its future.

Md Hanif Al Sabbir
Alumni of Changzhou University (CSE), Jiangsu, China

আমার চোখে ১৬ জুলাই ও স্বাধীনতা

ছবি: দ্যা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

১৫ জুলাই রাত! ভাবতে লাগলাম কীভাবে আন্দোলনে যাবো। সবে মাত্র চায়না থেকে এসেছি ইউনিভার্সিটির ভ্যাকেশনে। মন বলছে যৌক্তিক আন্দোলন এ না গিয়ে কীভাবে ঘরে বসে থাকি। মন বলেছে, তুমি বসে থাকো কীভাবে; তুমি যদি এভাবে বসে থাকো, বিবেকের কাছে, জবাব দেবে?

ফেসবুকে একটি পোস্ট দিলাম,

লেখাটা এমন ছিল, "কালজয়ী ইতিহাসের স্বাক্ষী হতে চলে আসুন আগামী কালের যৌক্তিক আন্দোলনে" সত্যিই দিনটি চিরস্মরণীয় থাকবে।

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের থেকে খবর পেলাম বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচি ১৬ জুলাই দুপুর ১২ টায়। এদিকে রংপুর সরকারি পলিটেকনিক ও RIIT-সহ আরও কিছু পলিটেকনিক তাদের কর্মসূচি ঘোষণা করে দুপুর ২টা ৩০ মিনিটে। আমি যেহেতু চায়নাতে পড়াশোনা করি স্বভাবতই ভয় ছিল আমার তো কোনো স্টুডেন্ট আইডি কার্ড নেই যেটা আমি আন্দোলনে দেখাতে পারব।

অনেক সময় এমন হয় আন্দোলনে বহিরাগত এসে বিশৃঙ্খলা করে, ভাবতে ছিলাম আমার সাথেও তো এমন হতে যে আমাকেও ভুল বুঝতে পারে সেই চিন্তা করে দুপুর ১২টার কর্মসূচিতে যোগ না দিয়ে দুপুর ২টা ৩০ এর কর্মসূচিতে চলে যাই (যেহেতু আমি RIIT পলিটেকনিক-এর প্রাক্তন শিক্ষার্থী)

আমাদের মিছিল রংপুর সরকারি পলিটেকনিক মাঠ থেকে শুরু হয়ে RIIT-এর সামনে দিয়ে রংপুর পায়রা চত্বর পৌঁছাতে আমি শুনলাম বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচিতে পুলিশ গুলি ছোড়ে। ইংরেজি বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী আবু সাঈদ ভাই পুলিশের গুলিতে নিহত। তখন নিজের ভেতরে ক্ষোভ হাজার গুণ বেড়ে গেল। আমরা বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাচ্ছি। ইমেজ পলিটেকনিক এর সামনে গিয়ে সবাই ভুয়া ভুয়া স্লোগান দিতে থাকে তখন ওই কলেজের একজন ম্যাম সাথে সাথেই আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়। একটু পরেই ইমেজ পলিটেকনিক আমাদের সাথে মিছিলে নেমে পরে।

সবার মুখে স্লোগান-

তুমি কে? আমি কে?

রাজাকার! রাজাকার!

কে বলেছে? কে বলেছে?

স্বৈরাচার সরকার!

মাঝে মাঝে বলছে,

কোটা না মেধা?

মেধা! মেধা!

আমার ভাই মরল কেন?

বিচার চাই! বিচার চাই!

এভাবে আমরা ইউনিভার্সিটি গেইটে চলে গেলাম;

পলিটেকনিকের শিক্ষার্থী ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থীও চলে এসেছে (অঘোষিত ভাবে)

শিক্ষার্থীর ঢল দেখে পুলিশ পালিয়ে গেছে। ইউনিভার্সিটির ভাই বোনেরা আমাদের দেখে তাদের আন্দোলনের মোড় ঘুরে গেল। তারা আরও তীব্র হয়ে গেল; কিন্তু ততক্ষণে আমরা হারিয়েছি এক বীরকে। এ দেশের এক সূর্যসন্তানকে। যাকে ঘিরে তার পরিবার অনেক বড় স্বপ্ন দেখত। এই তো কয়েক দিন পরেই তার গ্রাজুয়েশন শেষ হতো। বরাবরই শিক্ষা জীবনের শুরু থেকেই মেধা তালিকায় তার নাম শীর্ষে ছিল।

একের পর এক বুলেট তার বুক চিড়ে ভেতরে যাচ্ছে। কিন্তু সে দাঁড়িয়ে আছে সিসা ঢালা প্রাচীরের মতো। হার না মানা এক বীর! নির্দয় পুলিশের বুলেট সাঈদ ভাইয়ের কাছে হার মেনে যাচ্ছে! সে ভাবতেও পারেনি তার দেশের পুলিশ ভাই তাকেই গুলি করবে। তার বিশ্বাসকে ভুল প্রমাণ করে একের পর এক গুলি করেই যাচ্ছে। আর সাঈদ ভাই গুলি হজম করেও দাঁড়িয়েই আছে। হার না মানা এক মহাবীর। ৫২, ৬৯ ও ৭১ এর সেই বীরদের কাতারে নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখলেন।

বিকেল হয়ে গেল। পুলিশ আর বিজিবি বারবার ভার্সিটির দিকে আসার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমাদের বাধার সম্মুখীন হয়ে বারবার পিছু হঠতে লাগল, সকল শিক্ষার্থী; পুলিশ ও বিজিবি কে বলতে লাগল গো ব্যাক গো ব্যাক।

এক পর্যায়ে এমন পরিস্থিতি হয় এই বুঝি আবার গুলি শুরু করে। যেহেতু সামনেই ছিলাম জীবনের আশাও ছেড়ে দিলাম। একটু পর পরিস্তিতি একটু শান্ত হলো, পুলিশ ও বিজিবি পিছু হঠতে শুরু করে। আমাদের দাবি ছিল আবু সাঈদ ভাইয়ের লাশ ফিরিয়ে দিন। এভাবেই চলতে থাকলো সন্ধ্যা পর্যন্ত।

রাত যখন ৮টা শিক্ষার্থী অনেক কমে গেল। ভার্সিটির ভাইবোনেরা বলাবলি করছে যে, সবাই চলে গেলে রাতে আমাদের সাথে জানিনা কেমন আচরণ করবে? বেগম রোকেয়ার EEE-এর শাহিন ভাইসহ লালবাগের সামনে একা ফান্টা হাতে ২ চুমুক দিয়েছি,হঠাত পুলিশ ২টি টিয়ারশেল ছুড়লে মুহূর্তেই সবাই ছোটাছুটি শুরু করে। জীবনে প্রথম বার টিয়ারশেল-এর জন্ত্রণা পেলাম চোখে মুখে ফান্টা দিচ্ছিলাম। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। এত টুকুই আমার সহ্য হচ্ছিল না। (যাদের বুক গুলিতে ঝাঁঝরা করে দিচ্ছে, পিটিয়ে রক্তাক্ত করে ফেলেছে, কত নির্যাতন করেছে। তাদের আহাজারিতে হয়তো আকাশ-বাতাস ছেয়ে গেছে। কত নির্মম ছিল) কয়েকজন মহিলা মাটিতে গড়াগড়ি শুরু করল, দৌড়ে গিয়ে এক ফার্মেসিতে ঢুকে দরজা বন্ধ করলাম। কিন্তু সেখানে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। তাই বের হয়ে রাস্তার উলটো দিকে দৌড় শুরু করলাম।

আবু সাঈদ ভাইয়ের ভিডিওটি সারা দেশের মানুষের মন ভেঙে চুরমার করে দিলো। দেশ বিদেশের মানুষের কান্নায় হয়ত আসমানের ফেরেশতাও যোগ দিয়েছিল সেই কান্নার মিছিলে। সবার জীবন বিলিয়ে দেওয়ার এক আকাঙ্ক্ষা তৈরি হলো। সারা দেশে তীব্র আন্দোলন শুরু হলো। রাজপথে সবাই নেমে এলো। কোটা আন্দোলন আর কোটা আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার নয়। তার শহিদ হওয়াই ছিল স্বাধীনতার অন্যতম কারণ।

এরপর মুগ্ধ ভাই সহ একের পর এক লাশ পড়তে থাকলো। মুগ্ধ ভাইয়ার পানি লাগবে? পানি! কথাটা সবার

মনে দাগ কেটে দিচ্ছিল। পুলিশের জন্য অনেকের মতো আমারও আর বাড়িতে থাকা হলো না। এভাবেই চলতে থাকলো ৩৫ জুলাই পর্যন্ত (৪ আগস্ট), এর মাঝেই ইন্টারনেট বন্ধ করে স্বৈরাচার সরকার শেখ হাসিনা বাংলার অসংখ্য মানুষকে শহিদ করে দিলো। বাংলাদেশ একটি রণক্ষেত্রে পরিনত হয়ে গেল। এক দিকে নিরস্ত্র শিক্ষার্থী অন্যদিকে অস্ত্রে সুসজ্জিত পুলিশ ও ছাত্রলীগ সহ প্রশাসনের লোক। শিক্ষার্থীদের তাজা প্রাণ ঝড়তে লাগল। বাঁচতে পারল না ছোট বাচ্চাও। আর্মিদের ট্যাঙকে লাল নিশানা। হেলিকাপ্টার থেকে গুলি ছুড়ে মানুষ মারছে নির্দ্বিধায়। কতটা নির্দয় হলে এভাবে পাখির মতো মানুষ মারতে পারে সেটা আজও হয়ত গোটা জাতি চিন্তা করে চোখের কোনো পানি জমায়। পাঁচ মিনিট আটাশ সেকেন্ডের একটা ভিডিও দেখলে কঠিন হৃদয়ের মানুষও ডুকরে কান্না শুরু করবে। এই অবস্থা দেখে বাংলার সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ তাদের সাথে রাজপথে নেমে পরল। খবর উপস্থাপক তার পোশাক বদলিয়ে আইনজীবী বনে গেল। রিকশাচালক, শিক্ষক, শ্রমিকসহ সবাই এক হয়েগেল। প্রবাসী ভাইয়েরা রেমিটেন্স বন্ধ করে দিলো। যমুনা টেলিভিশন সত্য তুলে ধরছে। কী এক ঐক্য , সবাই যেন একপ্রাণ! ১৯৭১ সালের মতো সবাই এক হয়ে সরকার পতনের ১ দফা আন্দোলনের ডাক দিলো। ৩৬ জুলাই (৫ আগস্ট) প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়। সবার ফেসবুক প্রোফাইল স্বাধীনতা লেখা পোস্টে ভরে গেল স্বাধীনতার আনন্দে মেতে উঠল দেশ। Gen Z দেখিয়ে দিলো তাদের সাহস ও সক্ষমতা। তারপর শিক্ষার্থীরা দেশ সংস্কারের কাজে নিয়োজিত হতে লাগল। তারাই হয়ে গেল ট্রাফিক পুলিশ। হয়ে গেল দায়িত্ববান নাগরিক। বদলে দিতে লাগল দেশের প্রেক্ষাপট।

সবাই এখন মন খুলে কথা বলতে পারে। কেউ কোনো পোস্ট করলে আবরার ফাহাদ ভাইয়ের মতো আর জীবন দিতে হবে না। কোনো সমস্যা হলে সবাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষে হাতে হাত দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পরে। এ যেন এক মহাঐক্য!!

সবাই আমাদের দেশকে বাহবা দিচ্ছে, আমাদের দেশকে অনুপ্রেরণা হিসেবে গ্রহণ করছে। এমন একটি দেশই তো চেয়েছিলাম আমরা।

শোন বন্ধু!

"আমরা দুর্বল হতে পারি

কিন্তু ঐক্যবদ্ধ।"

এভাবেই এগিয়ে যাবে দেশ, প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্য।

পরবর্তী প্রজন্ম মানবতার শিক্ষা পাবে।

হাজার কোটি গল্প ,উপন্যাস , কবিতা লিখলেও শেষ করা যাবেনা এই বাঙালির ইতিহাস ও অবদান।

শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি এই বাংলার জন্য জীবন দেওয়া প্রতিটি বীরপুরুষকে।

আমাদের ভাষ্য হোক

"আমার বাংলাদেশ আমিই গড়ব ইনশাআল্লাহ"।

মোঃ ফজলুল করিম ফুয়াদ

ঊঝৌ ইউনিভার্সিটি, গুয়াংশি, চায়না।

চির অম্লান জুলাই

ছবি: ঢাকা ট্রিবিউন

৫২ দেখিনি; ২৪ দেখেছি! বাংলার ইতিহাসে জুলাই, ২৪-এক অমর নাম। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের একটি সাধারণ বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন কোনো এক শক্তিশালী জাদুর প্রভাবে একটি দেশের ভিত্তি পুনর্গঠিত করে দিয়েছিল। এখনও কানে বাজছে সেই অমর স্লোগান—

"জেগেছে রে জেগেছে, ছাত্র সমাজ জেগেছে!
লেগেছে রে লেগেছে, রক্তে আগুন লেগেছে!" "জ্বালো রে জ্বালো, আগুন জ্বালো!

স্বৈরাচারের গদিতে, আগুন জ্বালো একসাথে!"

জুলাই '২৪ সেই সত্যেরই প্রমাণ যা বলে, "পাপ তার বাপকেও ছাড়ে না।" জুলাইয়ের ইতিহাস হাজারো শহিদের ইতিহাস! জুলাইয়ের ইতিহাস আর এক স্বাধীনতার ইতিহাস! জুলাই, ২৪-কে খুব কাছে থেকে যারা দেখেছিল, সেই ভাগ্যবান অথবা দুর্ভাগাদেরই একজন আমি। জুলাই, ২৪-এর সূচনা তো আমার ক্যাম্পাসেই, আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস; এটিই স্বাধীন বাংলার ইতিহাসের আঁতুড়ঘর। মনে পড়ে ২৭ শে জুন রাতের কথা। টিউশন থেকে ফিরে শুয়ে ছিলাম গণরুমে। কিছু সিনিয়র ভাই এসে লিফলেট বিলি করলেন। লেখা ছিল লিফলেটে—আমরা মানি নাকো কোনো অন্যায়। চলো সব রুখে দাঁড়াই। ইতিহাসের পাতা উল্টানোর সেটাই তো শুরু! জুলাই এর শুরু! বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এমনই ছিল যে , যেন একঝাঁক পিপীলিকা; যারা একের পদাঙ্ক অন্যরা অনুসরণ করে। চেয়ে দেখ, আমিও সেই কালো পিপীলিকাদেরই একজন। ফজলুল হক মুসলিম হল সহ কার্জন এলাকার শহিদুল্লাহ আর একুশে হলের ছাত্ররা একযোগে রাজু ভাস্কর্যে যেতাম। মিছিলে যাওয়া কেনো যেন নেশার মতো হয়ে গিয়েছিল। স্লোগান শুনলে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারতাম না কোনোভাবেই। ক্লান্ত বা অসুস্থ হয়েও কীভাবে যেন ছুটে বেরিয়ে যেতাম। যেন মিছিলের ধ্বনি আমাকে ডাকত বারবার শতবার। সেকি ঐক্য, সেকি চেতনার ফুল তরুণ প্রাণগুলোতে। স্লোগানে স্লোগানে গলা ভেঙে গেলে শুকনো ঢোক গিলেছি তবুও থেমে যাইনি। *কোটা না মেধা? মেধা মেধা!*

আপস না সংগ্রাম? সংগ্রাম সংগ্রাম!

তারপর এলো বাংলা ব্লকেড; সারা বাংলা ব্লকেড। শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয় এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে সারা দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। আন্দোলনের এই অংশেই প্রথম স্বৈরাচারের গদিতে কাঁপন ধরে। আসতে থাকে শত বাধা শত হুমকি। দিনে আন্দোলন করতাম আর রাতে গেস্ট রুম এ আন্দোলন এ যাওয়ার জন্য বকা খেতাম। লুকিয়ে লুকিয়ে শাহবাগে যেতাম ছাত্রলীগ এর জানোয়ারদের চোখ ফাঁকি দিয়ে। ছাত্রলীগ ও পুলিশের বাধা কি দামাল ছেলেদের আটকাতে পেরেছিল? উত্তর তো খুবই সোজা! ১৫ জুলাই, ২৪ যে দুর্ভাগারা দেখেছিল, আমি তাদেরই একজন। এটি তো সেই কোনো দিন যেদিন , ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিরস্ত্র সাধারণ আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ চালায়। আরও একবার রক্তে রঞ্জিত হয় এই মহিমান্বিত ক্যাম্পাস। নিজ চোখে দেখা সেই ভয়াবহতা কি ভুলে যাওয়া সম্ভব? আমার ভাই-বোনেদের ওপর নির্মম আঘাত বাঙালি জাতির ইতিহাসের একটি কালো অধ্যায় হয়ে থাকবে চিরদিন। আহত বন্ধুদের দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাই। জরুরি বিভাগের মেঝেতে আমার ভাই-বোনেরা রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল। সেদিন কান্না আমার বাঁধ মানেনি। রক্তে প্রতিশোধের আগুন দাউদাউ করে জ্বলছিল। কি অসহ্য সেই যন্ত্রণা! দুঃখ-ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ফিরে যাচ্ছিলাম শহিদুল্লাহ হলের দিকে। আমিসহ আমার বন্ধুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোগো যুক্ত টিশার্ট পরে ছিলাম। ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! আমাদের দিকে একদল অস্ত্রধারী সন্ত্রাসী তেড়ে এলো। যে যেদিকে পাই দৌড়িয়ে পালিয়ে গেছি। আমি পুনরায় হাসপাতালে ঢুকে পড়ি ও অন্য একজনের সঙ্গে টিশার্ট পরিবর্তন করি ও লোগোযুক্ত টিশার্ট খুলে ফেলি। শহিদুল্লাহ হলে ছাত্রলীগ-এর সঙ্গে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যাপক সংঘর্ষ চলছিল তখন। খানিক দূরে পুলিশ ফোর্স দাঁড়িয়ে ছিল মূর্তির মতো। তাদের কেউ কেউ ঘটনার ভিডিও ধারণ করছিল অবধি!

১৫ আগস্ট রাত্রিবেলা! সবাই ছাদে ইট তোলায় ব্যস্ত হয়ে পরে। লক্ষ্য, রাত্রিবেলা ছাত্রলীগের আক্রমণ প্রতিহত করা। সবাই ছাদে ঘুমানোর সিদ্ধান্ত নিই। সেই রাতে আমাদের সঙ্গে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটলেও, তাণ্ডব চলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর। পরদিন তো হলে হলে যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয়। গাছের ডাল থেকে বিছানার ডান্ডা, যার যা আছে তা-ই নিয়ে সবাই শত্রু মোকাবিলার প্রস্তুতি নেয়। সকাল থেকে রাত অবধি আমরা দোয়েল চত্বর, শহিদ মিনার ও কার্জন হল এলাকায় পাহারায় ছিলাম।

সেদিনের ঘটনা স্মৃতি থেকে মুছে যাওয়ার নয়। কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত বহু ঘটনারই সাক্ষী হয়েছিলাম সেদিন। পরদিন সন্ধ্যার মাঝেই হল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয় সবাই কে। জোর করে সবাইকে হল ছাড়তে বাধ্য করা হয়। সেদিন রাত থেকেই ইন্টারনেট শাটডাউন করে দেওয়া হয়েছিল। সেদিন গভীর রাতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনের দৃশ্য আমি কি কখনো ভুলতে পারব? দোয়া করছিলাম আল্লাহর কাছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইদের যেন তিনি রক্ষা করেন। তারপরের ইতিহাস এক সাগরের ইতিহাস। যে সাগর নোনা পানিতে পূর্ণ নয়; বরং নোনা লাল রক্তে পূর্ণ। এর পরের ইতিহাস সারা দেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়,স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ ও আত্মত্যাগের ইতিহাস। মাসব্যাপী যে কদর্যতার সাক্ষী হয়েছি, তা কি অল্প কয়েকটা বাক্যে প্রকাশ করতে পারব? না না! তা হয় না! তবে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে হলেও যা পেয়েছি, তা হলো 'মুক্তি'। স্বাধীন বাংলাদেশে আপনাকে স্বাগত।

মো : নাবিব আহমেদ

প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কেমন বাংলাদেশ চাই- ১

We want to see where everyone can get their rights equally no matter how rich or poor or what ethnicity he/she belongs to. This will help us to build an harmonize and unique society. As we are live in globalize village, we must need to ensure those five basic human needs. Also want to confirm all the basic needs for all the Bangladeshi citizen Education, Food, Health, Clothes and Shelters. More specifically our education system needs to be prioritize based on science and research development based. Where this could directly help us to build a strong economic development system. If we can confirm this, I am sure everyone will get the benefit of this for every sector.

Mohammad Russel

Associate Professor

Dalian University of Technology, P.R.China

কেমন বাংলাদেশ চাই- ২

আয়তনে অনেক বড় না হলেও জনসংখ্যায় সমৃদ্ধ দেশ বাংলাদেশ। প্রাকৃতিক সম্পদেও। সবচেয়ে বড় সম্পদ এদেশের তরুণ প্রজন্ম। সংখ্যায় বিপুল এবং উদ্যোমে ভরপুর। এই বিপুল সংখ্যক তরুণ প্রজন্মকে যদি মেধায়, যোগ্যতায় অনন্য করে গড়ে তোলা যায়, তাহলে বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর অন্যতম সেরা দেশ। প্রথম উদ্যোগ নিতে হবে শিক্ষা ক্ষেত্রে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে। কারিকুলাম করতে হবে আধুনিক, যুগোপযোগী ও আন্তর্জাতিক মানের। পরিবর্তন আনতে হবে পাঠদান পদ্ধতিতেও। শিক্ষকদের যোগ্যতা বাড়াতে দেশে বিদেশে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে যোগ্যতার ভিত্তিতে। গবেষণা বাড়াতে হবে। আর এসব উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য অবশ্যই শিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে হবে। দেশে আইনের শাসন নিশ্চিত করা একটি সভ্য রাষ্ট্রের প্রধান কাজ। আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান, সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত এই মৌলিক অধিকার পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর আইনের শাসন নিশ্চিত করতে প্রয়োজন স্বাধীন বিচার বিভাগ। বিচার বিভাগকে রাখতে হব নির্বাহী বিভাগের প্রভাব মুক্ত।

আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিশ্চিত করা। নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক সরকার কায়েম, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতমানের শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর মাধ্যমে আমরা স্বপ্নের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে পারবো, ইনশাআল্লাহ।

শাহাদত হোসেন

যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ, এডমিন, পাঠশালা CBS

কেমন বাংলাদেশ চাই- ৩

সর্বার্থে স্বার্থক বাংলাদেশ চাই, কিন্তু তাকে সোনার বাংলা বলতে চাই না। যে দেশের মানুষ বারবার পুড়েই খাঁটি সোনা হয়, সে দেশে সোনা কোনো মূল্যমান যাচাইয়ের মানদণ্ড নয়। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বকীয়তা বজায় রেখে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হোক। এমন দেশ চাই যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকবে এমন মানুষের হাতে, যার নাড়ি পোঁতা দেশের মাটিতে; যিনি ঔপনিবেশিক মনোবৃত্তি নিয়ে দেশের সম্পদ চুরি করে অন্য দেশে আশ্রয় তৈরি করবেন না। এমন দেশ চাই যে দেশে বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা প্রচলিত হবে। ধর্মনিরপেক্ষ এমন রাষ্ট্র চাই যেখানে ধর্মান্ধতা ও কুসংস্কারের স্থান হবে না, কিন্তু সকল ধর্মের আচার পালনের স্বাধীনতা থাকবে। এমন দেশ চাই যে দেশের রাজনীতি থাকবে সুশিক্ষিত ও ন্যায়পরায়ণ মানুষের হাতে; যারা সন্তানতুল্য তরুণদের তাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করবেন না। শিশু, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের জন্য নিরাপদ দেশ চাই। নারী-পুরুষ-নির্বিশেষে নানা পেশায় অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে সেই দেশে। এমন দেশ চাই, যেখানে কোনো নারী-পুরুষ বা শিশু নির্যাতিত হবে না। আইনের শাসন সকলের জন্য সমান হবে; আইন ও বিচারব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করে রাখা হবে না। নিরাপদ সড়ক নিশ্চিত করতে পারে, এমন রাষ্ট্র চাই। দেশ এমন হোক, যেখানে অশুভ বিদেশি সংস্কৃতির আগ্রাসন বন্ধ করে আন্তঃসাংস্কৃতিক বন্ধন তৈরির পাশাপাশি শুদ্ধ দেশীয় সংস্কৃতির চর্চ্চা হবে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় এগিয়ে রয়েছে এমন দেশ চাই, যেখানে চিকিৎসক হবেন বন্ধুসুলভ, দয়ালু ও আন্তরিক। কৃষক-শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে সক্ষম । চাওয়ার কোনো শেষ নেই; কিন্তু এমন দেশ চাই, যেখানে চাওয়াটা অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়।

ড. সাবিহা হক
অধ্যাপক, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় (লিয়েন ছুটিতে)।

কেমন বাংলাদেশ চাই- ৪

বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা হিসেবে বিগত ৫ই আগষ্টের বিপ্লবোত্তর যে পটপরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে, প্রকৃত পক্ষে সেটাই হলো বাংলাদেশের প্রকৃত স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার তাৎপর্য অত্যন্ত ব্যাপক। বাংলাদেশের সম্মুখে একটি ঐতিহাসিক মাহেন্দ্রক্ষণ এসে উপস্থিত হয়েছে এই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মন ও মনন, তাদের আশা আকাংক্ষা, ইতিহাস আর ঐতিহ্যের সাথে সামঞ্জস্যশীল মর্যাদাপূর্ণ পরিচয়ে গড়ে তোলার। এখানে সাম্য, সুবিচার, শোষণ বৈষম্যহীন মানবিক মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এমন একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন, যা মূলত ইসলামি দর্শনেরই প্রায়োগিক রুপায়ন মাত্র। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য দেশের প্রতিটি সেক্টরে সর্বোচ্চ যোগ্য ও স্বৎ কর্মীদের নিয়োগ ও পদায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এটাকেই আধুনিক বিশ্বে মেরিটোক্রাটিক সোসাইটি হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশকে এখন কেটি মেরিটোক্রোটিক সোসাইটি হিসেবে গড়ে তোলা গেলে কয়েক বছরের মধ্যে এই দেশ সফলতার পথে ফিরবে। তখন এমন একটি পরিবেশের জন্ম নেবে, যেখানে ইসলামি শাসনকে পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করার মতো উপযুক্ত সামাজিক মনস্তত্ত তৈরি হয়ে যাবে। আপাতত, বলা চলে, আগামি তিন বা চারটি দশতের জন্য এটাই আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিৎ।

জিয়াউল হক

সাইকোলজিস্ট, ইংল্যান্ড।

কেমন বাংলাদেশ চাই- ৫

ফ্যাসিবাদের পতনের পর খুব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন - আমরা কেমন বাংলাদেশ ২.০ চাই ? যারা ফ্যাসিবাদের পতন ঘটিয়েছেন, তারাও এই প্রশ্নের এক কথায় কোন উত্তর জাতির সামনে উপস্থাপন করেন নি। যদিও সংস্কার সংস্কার করে ফেনা তুলা হচ্ছে, কিন্ত সকল মন্ত্রনালয়ের সংস্কারের একক কি উদ্দেশ্য তাও পরিষ্কার করা হয় নাই। অন্যদিকে,দেশের রাজনৈতিক দলগুলিও সংস্কার সংস্কার করছে, কিন্তু তারা কেমন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চায় তাও তারা ভিশন আকারে তুলে ধরছে না । তবে দেশের জনসাধারণ ও রাজনীতিবিদরা হয়ত ভিন্ন ভিন্ন বাংলাদেশের কথা বলছেন বিক্ষিপ্তভাবে, বিচ্ছিন্নভাবে ও ব্যাপক শব্দ সম্ভারে, কিন্তু সবার অবচেতন চাওয়া সার্বিক দিক থেকে সুস্থ বাংলাদেশ - Healthy Bangladesh. আমাদেরকে physically, mentally, emotionally, spiritually, ethically, morally, financially, environmentally, socially, communally and politically সুস্থ বা healthy and sound বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। এরকম একটা হেলথি বাংলাদেশে সবাই কম বেশী সুখে থাকবে, সুখি হবে। আসলে আমাদের সবার চাওয়া Healthy and Happy Bangladesh. তাই নয় কি ?

ড. মুনির উদ্দিন আহমেদ

সহকারী অধ্যাপক, কাসিম বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।

কেমন বাংলাদেশ চাই- ৬

লাখো প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের এ বাংলাদেশকে এমন একটি দেশ হিসেবে দেখতে চাই, যেখানে থাকবে সামাজিক ন্যায়বিচার, মূল্যবোধের চর্চা, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা, এবং সব শ্রেণির মানুষের ভারসাম্যপূর্ণ সহাবস্থান। আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশে সরকারের মূল লক্ষ্য হবে জনকল্যাণ এবং দেশের সকল ধরনের কাঠামোগত উন্নয়ন। সব শ্রেণিপেশার মানুষ এখানে মানসম্পন্ন ও কল্যাণমুখী শিক্ষা এবং আধুনিক স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার অধিকারী হবে। প্রায়োগিক জ্ঞান অর্জন, মৌলিক জ্ঞান সৃষ্টি ও সৃজনশীলতা বিশববিদ্যালয়ের মৌলিক প্রাধান্যের জায়গা হবে। দরিদ্র ও অসহায় মানুষের জন্য কল্যাণমুখী ও বাস্তবসম্মত অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুরক্ষা বলয় থাকবে। সকল ধর্ম ও বিশ্বাসের মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকবে। নতজানু পররাষ্ট্র নীতির পরিবর্তে আমাদের কৌশলী কিন্তু উভয়ের জন্য সমান লাভজনক নীতির সফল প্রয়োগ থাকবে। প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ সুরক্ষা এবং পরিবেশ বান্ধব উদ্যোগ সবক্ষেত্রে নিশ্চিত হবে। আমাদের দেশের রেমিট্যান্স যোদ্ধাদের শুধু কায়িক শ্রম নয়, কারিগরি দক্ষতাতেও অবদান রাখার সুযোগ থাকবে। পাশাপাশি, নিজেদের খনিজ সম্পদ উত্তোলনে সক্ষমতা অর্জন করে বিদেশ নির্ভরশীলতা কমাতে হবে। দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জন করা হবে। বিদেশি ঋণের পরিবর্তে দেশীয় অর্থনীতির গতিশীলতার মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করা হবে। আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশে সকল রাষ্ট্রীয় সম্পদে জনগণের প্রাপ্য হিস্যা নিশ্চিত করা হবে এবং সকল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোকে শক্তিশালী করে একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র গড়ে তোলা হবে।

ড. মোঃ বশির উদ্দীন খান

সহযোগী অধ্যাপক, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, টাঙ্গাইল।

কেমন বাংলাদেশ চাই- ৭

বৈষম্যবিরোধী ছাত্রজনতার আন্দোলনের মাত্রই মাসকাল অতিক্রান্ত হয়েছে। এমতাবস্থায়, প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে দেখি অনেক স্বপ্ন, যেখানে সবাই সমান সুযোগ পাবে এবং আমাদের অগ্রগতির পথে যেসব সমস্যা রয়েছে, সেগুলোর সমাধান হবে। কিছু সমস্যা এবং তাদের সমাধান আমি মনে-প্রাণে কামনা করি।

বড় মাপের সংস্কার

রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতায় আসে, তারা যাতে পূর্বের মতো লুটপাট, দুর্নীতি, গুম-খুন, ক্ষমতার অপব্যবহার, বাক্‌স্বাধীনতা হরণের মতো অপরাধে আবারও জড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য রাষ্ট্রের কাঠামোগত সংস্কার, সংবিধানের সংশোধন এবং বিদ্যমান কু-নীতির বিলোপ অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে নিশ্চিত করতে হবে। দেশের সংবিধানে এমন পরিবর্তন আনা জরুরি, যাতে ভবিষ্যতে কোনো স্বৈরাচারের পুনরুত্থান ঘটতে না পারে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক প্রভাব দূর করা

দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয় প্রভাব ও লেজুড়বৃত্তির রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে দলমুক্ত রাখতে হবে, যাতে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকে। ছাত্র সংসদ থাকতে পারে, তবে সেটি হতে হবে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিকাশের উদ্দেশ্যে, রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের জন্য নয়।

স্বৈরশাসকদের বিচার

স্বৈরশাসক ও তাদের সহযোগীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে, সেটা প্রশাসন, মিডিয়া বা অন্য কোনো খাতে হোক। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো স্বৈরশাসক বাংলাদেশে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়ানো

দেশে শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বাজেট বাড়াতে হবে। আমি বসবাস করি নেদারল্যান্ডসে, ছোট্ট একটি দেশ কিন্তু কৃষি রপ্তানিতে বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে, যা গবেষণা ও উন্নত প্রযুক্তির ফলাফল। বাংলাদেশের জন্যও গবেষণায় বিনিয়োগ বাড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; কারণ, দেশের উন্নয়নে গবেষণার কোনো বিকল্প নেই।

আহত ও শহিদ পরিবারকে সহায়তা

বৈষম্যহীন ছাত্র আন্দোলনে আহতদের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। যেসব ছাত্রজনতা পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন, তাদের ও তাদের পরিবারের দীর্ঘমেয়াদি ভরণপোষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। একই সঙ্গে আন্দোলনে যারা শহিদ হয়েছেন, তাদের পরিবার যেন রাষ্ট্রের সুরক্ষার ছায়ায় থাকে।

দুর্নীতি ও ঘুস প্রতিরোধ

দুর্নীতি আমাদের রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিটি স্তরে জড়িয়ে রয়েছে। অফিস ও আদালতে ঘুসের কালচার সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করতে হবে। যারা ঘুস গ্রহণ করবে, তাদের কঠোর বিচারের আওতায় আনতে হবে। এজন্য আইনের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

বেকারত্ব কমানো

বেকারত্ব দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা, বিশেষ করে তরুণদের জন্য। শিল্পায়ন ও উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হবে। কর্মমুখী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাড়াতে হবে।

পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ

পরিবেশ দূষণ ও জলবায়ু পরিবর্তন দেশের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি। পরিবেশ রক্ষায় কড়া আইন প্রয়োগ করতে হবে এবং টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করতে

হবে। পুনর্বনায়ন কর্মসূচি এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্ব দিতে হবে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা

মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। কথায় কথায় মানুষকে "ট্যাগ" দিয়ে দমন করার কালচার বন্ধ করতে হবে। এজন্য আইন করে মানুষের স্বাধীন মতপ্রকাশের অধিকার সুরক্ষিত করতে হবে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

ধর্ম পালনের সত্যিকারের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে, যেখানে ইসলাম, সনাতন, বৌদ্ধ, খ্রিষ্ট্রানসহ সকল ধর্মের মানুষ নিজেদের ধর্ম পালনে পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করবে। পার্শ্ববর্তী একটি দেশের বিরূপ আচরণের কারণে গত ১৫ বছর দেশের মুসলমানগণও বৈষ্যমের স্বীকার হয়েছেন, যেকোনো ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে যেন এটি আর ভবিষ্যতে না ঘটে।

আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত, সুশাসিত, দুর্নীতিমুক্ত, সবুজ ও সুরক্ষিত বাংলাদেশ গড়ার জন্য একসাথে কাজ করি।

ড. রেজাউল করিম

ইমিউনোলজিস্ট, ইউত্রেখত, নেদারল্যান্ডস।

Bangladesh, I like to see

As a responsible citizen, I want to see Bangladesh as an egalitarian and welfare state where all citizens live in peace with equal right, full protection, dignity and respect regardless of their race or religion.

The recent victory of the student-led and people-supported movement that ousted the fascist regime after 16 years has clearly shown that peoples of Bangladesh want a nation that is free from discrimination, injustice, corruption, and politics of division and deception.

They also want to stop all ways and means of creating new dictators, political mafia, and a system of government that only serves the party in power and prevent from creating monsters in all levels of government who are masters of torture and oppression of people only to please the rulers and make unlimited money in the process.

In the spirit of the second independence, the government must look after every citizen by ensuring affordable basic needs of life including access to good quality education and healthcare. No leader or government official should go overseas for treatment before going to his or her local hospitals/doctors where ordinary people get treatment.

The government and public servants will be genuine service providers to the taxpayers, rather than becoming de-facto masters of the people who pay their salaries.

The nation must respect the martyrs of July-August movement by making the country free from all kinds of individual and institutional corruption left by the ousted government.

In Bangladesh every office, especially government offices, must eradicate all forms of bribing and should hang a signboard saying, 'This office is free from corruption' and put a phone number so that people could call and report if anyone asks for bribe.

The reformed education system and society in general must create, promote and reward people of good character with strong morality and ethical commitment, and warn people about the punishment for the criminals as per the law of the land.

The country must be a land of opportunities for young people who would get world-class education to serve humanity at home and abroad.

I wan to see increasingly large number of Bangladeshi professionals and scholars compete with their peers globally and contribute to the research and development process as equal partners. Bangladeshi Universities and research organisations must elevate their ranking through more significant contributions and collaborations.

The people and the society should honour, and respect fellow citizens based on their knowledge, honesty, humanity and good character, not for their position, power and wealth.

All appointments, including those in the universities, must be based on merits – education, experience, contributions, creativity, innovation, honesty, etc and stop appointments based one political activism or party allegiance.

Leaders at all levels and parties, including those lead the government, must the source of inspiration and guidance for the young people who would love to emulate them to be successful and good human being

Dr. Shahjahan Khan
Emeritus Professor, University of Southern Queensland, AUSTRALIA
Vice Chancellor, Asian University of Bangladesh, Ashulia, Dhaka, BANGLADESH
Expatriate Fellow, Bangladesh Academy of Sciences (BAS)
Founding Chief Editor, Journal of Applied Probability & Statistics (Scopus), USA
Past President, Islamic Countries Society of Statistical Sciences (ISOSS)
Past Director, Muslim Community Cooperative Australia (MCCA), Australia

বাংলাদেশ "তুমি বিশ্বের বিস্ময়, তুমি আমার অহংকার"

এক.

"বাংলাদেশ" নামক আমাদের আজকের এই ভূখণ্ডের মোটামুটি তিন হাজার বছরের লিখিত ইতিহাস আছে, নামও ছিলো ভিন্ন। যেমন:

• প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের কাছে এটা "গঙ্গারিডই" নামে পরিচিত ছিলো। (খ্রীস্টপূর্ব ৩০০ সাল) ।

• মধ্যযুগে এ অঞ্চলকে বুঝানোর জন্য "বাঙ্গালা" নামে পরিচিতি পায়। বাংলার সুলতানদের বাঙ্গালার শাহ বলে ডাকতো।

• মুঘলদের সময় এ অঞ্চলকে "সুবাহ-ই-বাংলা" বলে ডাকতো।

• বাংলাকে প্রথম বিভক্ত করে ব্রিটিশরা ১৯০৫ সালে - "পূর্ব বঙ্গ" ও পশ্চিশ বঙ্গ (যদিও অনেক অঞ্চল আলাদা করা হয়। যেমন- আসাম) । প্রবল আন্দোলের মুখে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করে।

• দ্বিতীয়বার বিভক্ত হয় ১৯৪৭ সালে। পূর্ব বঙ্গের নাম হয় "পূর্ব পাকিস্তান" (ত্রিপুরা চলে যায় ভারতের অংশে। সিলেট যুক্ত হয় পূর্ব পাকিস্তানের অংশে) ।

যাইহোক, এই তিন হাজার বছরের লিখিত ইতিহাসে আমাদের এই ভূখণ্ডে শেখ হাসিনার মতো এমন নৃশংস জালেম, চরম স্বৈরাচার, এবং ক্লেপটোক্রাটিক ফ্যাসিস্ট শাসক আর কখনোই আসে নাই। আর পৃথিবীর ইতিহাসে এমন মহিলা স্বৈরাচার আর দ্বিতীয়টা ছিলো বলে আমার জানা নেই। বর্তমান দুনিয়াতে তিনি "লেডি হিটলার" নামেও পরিচিতি পেয়েছেন।

দুই.

দুনিয়ায় ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত সবচেয়ে বড় অভ্যুত্থান ছিলো চীনের তিয়েনামিন স্কয়ারে (১৫ই এপ্রিল থেকে ৪ জুন, ১৯৮৯)। তবে কয়েক হাজার ছাত্র গণহত্যার শিকার হলেও এই অভ্যুত্থান সফল হয় নাই। বাংলাদেশে আমাদের নবীন শিক্ষার্থীরা যে গণঅভ্যুত্থান সংগঠিত করে দেশটাকে জালেমমুক্ত করলেন, সেটা পৃথিবীর ইতিহাসে "সবচেয়ে বড় ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত সফল গণঅভ্যুত্থান।" তারা উৎখাত করলো বাংলার গত তিন হাজার বছরের সবচেয়ে বড় ডেসপট বা স্বৈরশাসককে। ৫ই আগস্ট ২০২৪ পৃথিবীর ইতিহাসে একটা বিস্ময়কর ঘটনা।

তিন.

আজ থেকে শত শত বছর পরেও বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবী এই বিস্ময়কর ইতিহাস পড়বে, স্যালুট জানাবে আমাদের এই নবীন শিক্ষার্থীদেরকে, যারা বুলেটের সামনে বুক উঁচু করে দাঁড়িয়ে, সকল বাঁধা মাড়িয়ে উপহার দিয়েছে স্বস্তি আর স্বাধীনতার এক অনবদ্য স্বাদ। যুগ যুগ ধরে অনুপ্রেরণা নিতে থাকবে পৃথিবীর বঞ্চিত মানুষেরা।

তারুণ্যের এই বিস্ময়কর ইতিহাস বুকে ধারণ করেই আমাদেরকে গড়তে হবে নতুন বাংলাদেশ, যা একদিকে হবে বৈষম্যহীন, সমৃদ্ধ, আর সুবিচার এবং ইনসাফে পূর্ণ; অন্যদিকে হবে সব ধরনের জুলুম এবং অন্যের বশ্যতা থেকে মুক্ত।

ড. মুহাম্মাদ সাইদুল ইসলাম

সহযোগী অধ্যাপক, নানইয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি, সিংগাপুর।

"The Role of the Student Community in State Reform"

ছবি: দ্যা গার্ডিয়ান

State reform, which involves the modification or development of a nation's existing structure, policies, and systems, is an essential part of national progress. The role of the student community in this process is unparalleled. History bears witness to the fact that, time and again, the fearless contributions of students have played a crucial role in the reconstruction of the state. This essay will provide a detailed analysis of the role and struggles of students in Bangladesh's history.

Background of Student Movements:

Students have always been regarded as the focal point of a nation's progress. A student, through their intellect, consciousness, and ideals, can significantly influence a nation. The spontaneous movements of students for the advancement and reform of the country have repeatedly been proven effective. From the Language Movement of 1952 to the Liberation War of 1971, the history of student struggles in Bangladesh is long and glorious.

However, over time, various irregularities and injustices emerged within the state, prompting the student community of Bangladesh to unite once again in July 2024. The movement of July 24, 2024, marked a milestone on the path to establishing a just institution in an independent state.

The July 24 Movement and Its Impact:

The July 24 movement was a direct protest by the student community against inequality, autocracy, and injustice. What began as a simple anti-discrimination movement by university students quickly transformed into a powerful force that restructured the entire foundation of the country. This movement demonstrated that "injustice spares no one," not even its creators.

Students of Dhaka University initiated the movement collectively. From its inception, the university campus became the epicenter of the movement. Students from various halls united at the Raju Sculpture and from there, the movement spread across the entire nation. In this movement, students were prepared to sacrifice themselves, not just to protect the educational environment, but in the pursuit of justice. As a result, the foundation of the autocratic regime was shaken, compelling the state to undergo a complete reformation.

Contributions of the Student Community to State Reform:

The July 24 movement proved that the student community is a significant force within the state. Their united struggle, intelligence, and unwavering sense of justice laid the groundwork for establishing a prosperous and just state. Students not only identify the existing problems within the state but also propose solutions.

This movement served as a powerful protest against the discriminatory policies and corrupt institutions of the state. Consequently, there was a wave of changes in the state's policies and structures, leading the nation towards the establishment of a just and equitable state.

Conclusion:

The role of the student community in state reform is absolutely indispensable. They represent the future of the nation, and through their struggles and sacrifices, the state can progress. The movement of July 24, 2024, demonstrates that when students unite, no irregularity, inequality, or corruption within the state can persist. This movement reminds us that the contributions of the student community in establishing justice and forming a well-structured state will always be remembered.

MD NAYEEM SADMAN

GUIZHOU UNIVERSITY, CHINA

চীন-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর : ২৪-এর গণঅভ্যুত্থান পরবর্তী উন্নয়ন, পুনরুদ্ধার ও পুনর্গঠনের পথে নতুন বাংলাদেশ

২০২৫ সালে চীন-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তি হতে যাচ্ছে। এই সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরে উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের ছাত্রজনতার গণ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন ঘটেছে এবং বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উচিত দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে পরীক্ষিত বন্ধু ও উন্নয়ন সহযোগী চীনের সাথে গভীর সম্পর্কোন্নয়নের দিকে মনোযোগ দেওয়া। চীন ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের শুরু হয়েছিল ১৯৭৫ সালে, যখন চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। এই সম্পর্ক পরবর্তী সময়ে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি এবং অবকাঠামো উন্নয়নে গভীরভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। চীনা কোম্পানিগুলো বাংলাদেশে বিভিন্ন মেগা প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে, যেমন পদ্মা সেতু, পায়রা সমুদ্রবন্দর, মাতারবাড়ি বিদ্যুৎকেন্দ্র এবং কর্ণফুলী টানেল।

বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নীতিনির্ধারকদের দ্বারা চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে চীনে বসবাসরত আমরা ছাত্র-গবেষক-চাকরিজীবী-ব্যবসায়ীরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। সরকার দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে চীনের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করতে পারে। এর মধ্যে চীনের প্রস্তাবিত বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI)-এর সাথে বাংলাদেশকে আরও কার্যকরভাবে যুক্ত করার সুযোগ রয়েছে। চীনা বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প, যেমন তিস্তা প্রকল্প, ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারে। তিস্তা প্রকল্প হলো বাংলাদেশের একটি দীর্ঘমেয়াদি এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জল ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। এই প্রকল্পের মাধ্যমে তিস্তা নদীর পানি নিয়ন্ত্রণ, সেচব্যবস্থা উন্নয়ন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। চীনের অর্থায়ন এবং প্রযুক্তি সহযোগিতার মাধ্যমে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব, যা বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়ক হবে। চীন এই প্রকল্পের ব্যাপারে কতটা সিরিয়াস এবং আন্তরিক সেটা আমরা বাংলাদেশে চীনের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত মি. লি জিমিংয়ের তিস্তা নদী ও রংপুরের গংগাচড়া উপজেলা পরিদর্শনের মাধ্যমে বুঝতে পারি। ইতোমধ্যে চীনের তরফে এই প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্টাডিও সম্পন্ন করা হয়েছে।

চীনের সহযোগিতায় বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি পুনর্গঠিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল প্রকল্পটি চীনের অর্থায়ন এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছে, যা চট্টগ্রামের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ত্বরান্বিত করছে। এ ছাড়া, চীনা প্রযুক্তি এবং

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের শ্রমশক্তিকে দক্ষতর করে তোলা সম্ভব, যা বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। চীনের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ক্রমবর্ধমান। ২০২৫ সালে কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তিকে কেন্দ্র করে উভয় দেশের মধ্যে বিনিয়োগ এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও গভীরতর করা যেতে পারে। চীনের বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলিতে (EPZ, SEZs) বিনিয়োগ করতে পারে, যা নতুন শিল্প স্থাপন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে সহায়ক হবে। পাশাপাশি, চীনের বিশাল বাজারে বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে, যা দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

বাংলাদেশের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে শিক্ষা, প্রযুক্তি ও স্বাস্থ্য খাতে চীনের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বমানের চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ বিনিময় প্রোগ্রাম চালু করা, চীনের উন্নত প্রযুক্তি বাংলাদেশে স্থানান্তর করা এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতে চীনা চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ওষুধের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা বাংলাদেশের পুনর্গঠনে সহায়ক হবে। ২০২৫ সালে চীন-বাংলাদেশ কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর পূর্তিকে কেন্দ্র করে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন, অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে চীনের সাথে গভীর সম্পর্কোন্নয়নের মাধ্যমে নতুন এক বাংলাদেশের দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। তিস্তা প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পগুলো চীনের সহযোগিতায় সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে, তা বাংলাদেশের উন্নয়নের পথে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

সাইফুর রহমান

ডংহুয়া ইউনিভার্সিটি, সাংহাই, চীন।

সংগ্রামী ২রা আগস্ট

ছবি: এনপিআর

লেখাটা ২ আগস্ট লিখেছিলাম। রাজপথে সেভাবে নামা হয়নি, যেরূপটা আজ হয়েছিল। আমি কুয়েটে ৩য় বর্ষে অধ্যয়নরত আছি। মনে থাকবে এই সংগ্রামী ২ আগস্ট। আমি আর সাথে আমারই এক জুনিয়র ছিলাম। আজ ছিল গণমিছিল। আজ খুলনা রণক্ষেত্রে পরিণত করেছিল আইনশৃঙ্খলা বাহিনী নামের দালাল পুলিশ বাহুনী। জুমার নামাজের পর আমরা একত্রিত হই শিববাড়ি, খুলনায়। নিউমার্কেটে একটা চক্কর দিয়ে বিশাল আমাদের মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে গল্লামারি যায়। এতক্ষণ পুলিশ কোনো বাধা দেয়নি। কিন্তু গল্লামারি থেকে জিরো পয়েন্টে যাওয়ার সময় খুলনা ভার্সিটি গেটে অবস্থানরত পুলিশ ছাত্রজনতার ওপর অতর্কিতভাবে হামলা করে। প্রায় আধঘণ্টা ধরে তারা রাবার বুলেট, টিয়ার শেলের বিপরীতে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ চলছিল বৃষ্টির মতো। অনেক স্টুডেন্ট টিয়ার শেল আর রাবার বুলেটের কারণে হতাহত হয়, ধাওয়া-পালটা ধাওয়া চলতে চলতে এক পর্যায়ে পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হয়। এভাবে আমরা জিরো পয়েন্ট দখল করে ফেলি। আর সেখানে বিজিবি বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেও সক্ষম হয়না। পুলিশ হরিণটানা থনায় গিয়ে অবস্থান নেয় আর সেখান থেকে টিয়ার গ্যাস, সাউন্ড গ্রেনেড, রাবার বুলেট মারতে থাকে। এমতাবস্থায় ছাত্রসমাজ ধাওয়া দেয় বারবার। সময় তখন বিকাল সাড়ে চারটা। বৃষ্টি শুরু হয়, যেই বৃষ্টি সন্ধ্যা পর্যন্ত থমথম চলছিলই। টিয়ার গ্যাস থেকে বাঁচতে জিরো পয়েন্টে অনেক জ্বালাও-পোড়াও করে ছাত্রসমাজ। পুরো ময়দান ছিল রণক্ষেত্র, কিছুক্ষণ পরপর পুলিশকে ধাওয়া দেই আমরা। এ অবস্থায় পায়ে ও মাথায় রাবার বুলেট দ্বারা আহত হই আমি। একপর্যায়ে পুলিশ সারেন্ডার করার কথা বলে আমাদের চুপ করার দীর্ঘ চেষ্টা চালায়।

বীরের বেশে আমরা জিরো পয়েন্টে খোলা রাস্তায় আসরের নামাজ আদায় করে আবার শান্তিপূর্ণভাবে শিবাবাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। ব্যাক যাওয়ার সময় ঠিক খুলনা ভার্সিটির একটু সামনেই সন্ধ্যাবাজারের ওখানে ওপাশের তথা সোনাডাঙ্গা থানার পুলিশেরা আবার আমাদের হামলা করে। আবার টিয়ারশেল, রাবার বুলেট ছুড়ে ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করে। এই অবস্থায় বেশ কিছু সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে পুলিশ। তারা তীব্রবেগে গুলি বর্ষণ আর

টিয়ারশেল মারতে থাকায় ছাত্ররা পিছু হটতে থাকে এবার আর কিছুটা ছত্রভঙ্গও হয়ে যায়। যার কারণে ছাত্রসংখ্যা কিছুটা কমে যায়। কিন্তু এখানেও পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হয়। যেয়ে অবস্থান নেয় সোনাডাঙ্গা থানায়।

সব থেকে ভয়ানক অবস্থা তৈরি হয়েছিল গল্লামারী থেকে যখন আমরা সোনাডাঙ্গা যেতে থাকি। আমরা সোনাডাঙ্গা থানার কাছাকাছি যেতে না যেতেই তারা এই সময়ে থেকে বৃষ্টির মতো রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড আর টিয়ার গ্যাস ছুড়তে থাকে। চারদিকে ধোঁয়ায় ভরে যায়। তখন প্রায় সাড়ে ছয়টা। ছাত্ররাও বারবার সামনে যায় আবার পিছু নেয়। এভাবে প্রায় দেড় ঘণ্টা চলতে থাকে এই সংঘর্ষ।

এভাবে পুলিশবাহীনী সামনে আসতে থাকে, তারা আমাদের কোনোভাবেই সোনাডাঙ্গা পার হতে দেয়নি। সন্ধ্যা বাড়ার সাথে সাথে ছাত্রদের সংখ্যাও কমতে থাকে। একটা সময়ে দালাল পুলিশেরা আমাদের ওপর তাদের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে রাবার বুলেট, সাউন্ড গ্রেনেড আর টিয়ারসেল ছোড়ে, যার কারণে আমরা পেছনের দিক থেকে ময়লাপোতা হয়ে শিববাড়ি যেতে থাকি।

দুঃখের বিষয় ময়লাপোতা দিয়ে যাওয়ার সময় তখন ছাত্রদের তিন ভাগের এক ভাগও আর নাই। কিন্তু বাংলার অদম্য সন্তানরা কখনো রাজপথ ছাড়েনি, আমরাও ছাড়িনি। এভাবে আমরা শিববাড়ি আসার সময় খুলনা জেলা হতে আওয়ামী কার্যালয় আর তাদের যত ফেস্টুন সব বিদায় করে বিজয়ের বেশে শিবাবাড়ি পৌঁছে আজকের মতো শেষ করি।

পরিশেষে, বলার উদ্দেশ্য একটাই, আমরা চুপ করে আছি বলেই আজকে পুলিশ আর স্বৈরাচার সরকার আমাদের ওপর আঘাত করার সুযোগটা পাচ্ছে। আজকে যারা ঘরে বসে আছে, তারা কালকে যে ধরা খাবে না তার কোনো গ্যারান্টি দিতে পারবেন কেউ। ঘরে থাকলেই যে আপনি সেফ এটা মনে করিয়েন না। আপনি কোথাও নিরাপদ নন। এই বাংলাদেশের কেউই আজ নিরাপদ নয়। ক্লাস সিক্স-সেভেনের বাচ্চা এই রণাঙ্গনে বেড়িয়ে গেসে, ওদের কি মা বাপ নাই! ওরা কীসের তাগিদে এসেছে। অথচ ভার্সিটির এত এত স্টুডেন্ট বাসায় বসে আছে। একটু লজ্জা হওয়া দরকার না!

বাংলার মেয়েরা হিরো। আজকে একশর ওপর মেয়ে দেখলাম বাঘিনির মতো সামনে সামনে ফ্রন্ট লাইনে ছিল। কেউ কেউ তো একদম পুলিশের সামনে চলে গেসে। এই সাহস শত শত ছেলেগুলারও নেই।

আরেকটা কথা, অজস্র গার্ডিয়ান মা, বাবারা ছিলেন আমাদের সাথে।

আমাদের বিজয় সন্নিকটে। আমি দেখতে পাচ্ছি এই খুনি সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী।

দফা এক দাবি এক, খুনি হাসিনার পদত্যাগ। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরও দেবো।

আজ আমার দেশ অসুস্থ, দেশকে সুস্থ করতে সবাই রাজপথে নেমে আসুন। নয়তো সবাইকে মারা পরতে হবে মনে রাখিয়েন।

আব্দুল গোফরান বান্না
খুলনা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।

স্থিতাবস্থার বয়ানঃ যে বয়ানে স্থিতাবস্থা বজায় থাকে

ছবি: দ্যা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড

পালটা বয়ান হাজির করে যেকোনো অন্যায়কে জাস্টিফাই করবার জন্য দাসানুদাস মিডিয়া ও বুদ্ধিজীবী এবং বিশেষ কালচারাল ফন্টের বরকন্দাজেরা রেডি থাকেন। পুলিশের বন্দুকে ছাত্রজনতার আহত হওয়া ও শহিদ হওয়ার বিপরীতে উপস্থাপন করা হবে, হাইলাইট করা হবে এই তথ্য যে, পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল মারা হয়েছে ও পুলিশ আহত হয়েছে। হত্যাকারীর বোমাকে আড়াল করে সম্মুখে তুলে ধরা হবে হত্যাকৃতের ইট-খণ্ডকে। এভাবে লঘু করে ফেলা হবে হত্যাকাণ্ডকে, ও ন্যায্য প্রতিপন্ন করা হবে রেজিমকে, স্ট্যাটাস কো-কে। ফিলিস্তিনি বালকের পাথর নিক্ষেপকে ছুতো ধরে ইসরাইলের কামান দাগানোর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

বলা হবে, বেহেস্ত ও হুরের লোভে যে মরতে যায়, তাকে বাঁচায় কে। হত্যাকাণ্ড করে উপকারই যেন করা হলো। যে মারল তার অন্যায়, অপরাধ ও ইন্টেশনকে লঘু করে দোষারোপের তির নিক্ষিপ্ত হবে যে ভিকটিম,তার দিকে। এইভাবে হত্যাকাণ্ডের পক্ষে অশুভ যুক্তির জাল তৈরি করা হবে।

লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস, গুলি ও স্টেট ভায়োলেন্সকে আড়াল করে সামনে আনা হবে ভিকটিমের প্রতিবাদের ক্যাজুয়ালিটিকে এবং অনুগত ও দোসর সংবাদমাধ্যম তাকে উপস্থাপন করবে "তাণ্ডব" বলে। ফলে, নজর ও ভাবনা চলে যাবে উলটো দিকে, আড়াল হবে মূল অপরাধীর অপরাধ।

বিকল্প নেই...এই ধোঁয়া তুলে দায়মুক্তি দেওয়া হবে রেজিমের অপকর্মকে। অধিকতর দুঃসময়ের সম্ভাবনার আলাপ তুলে এস্টাব্লিশমেন্টেকে টিকিয়ে রাখার যুক্তি হাজির করা হবে। যা আছে তার চেয়ে যা হবে তা অধিক অমঙ্গলজনক, এই যুক্তি হাজির করে যেকোনো উদ্যোগকে প্রশ্নবোধক করে তোলা হবে। এই দায়িত্ব পালন করবে মিডিয়া ও বুদ্ধিচুতিয়াগণ!

কোনো ন্যায্য আন্দোলনের এজেন্সি "অপর"-এর হাতে চলে গেলে সকল সংগ্রামের তথাকথিত ধজাধারীরা " জুজু" হাজির করবে, এই দেশ বা ওই দেশ তালেবান হবে, মৌলবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে, অমুক পক্ষ লাভবান হবে। সুতরাং, যা আছে তাই যুক্তিসংগত। What is real is rational.এইভাবে বজায় রাখা হয় স্থিতাবস্থা, সূক্ষ চাতুর্যে।

স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদকারী বা আত্মদানকারীর কর্তাসত্তাকে নাকচ করে প্ররোচনার ধোঁয়া তোলা হবে। বলা হবে, এরা উস্কানিমূলক ইন্ধনের শিকার। সুতরাং শিকারির তিরের, বন্ধুকধারীর গোলার অপরাধের চেয়ে সামনে চলে আসবে তথাকথিত ইন্ধনদাতাদের প্রসঙ্গ। ফলে প্রকৃত অপরাধী খালাস পাবে। এইভাবে স্টাটাস কু বজায় রইবে।

নির্যাতকগোষ্ঠীকে দৃষ্টির আড়ালে রেখে নির্যাতিতের মুখকে দৃশ্যমান করে , নির্যাতিতকে সূক্ষ চাতুর্যে ব্লেমিং করা নির্যাতন-কাঠামোর পক্ষে দাঁড়ানোর আরেক সুরত।

নির্যাতন বা হত্যাকাণ্ডের শিকারকে পশ্চাৎপদ, প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি ট্যাগিং-এর মাধ্যমে অপরায়ন করে ও তাঁর মানবসত্তাকে ছেঁটে ফেলে তাকে হত্যায় কোনো অপরাধ নেই, এমতো সম্মতি- উৎপাদনের সচেতন বা অসচেতন উদ্যোগের ভেতরে হাজির থাকে বিদ্যমানকেই মোক্ষরূপে টিকিয়ে রাখার তথাকথিত বৌদ্ধিক বাসনা ও প্রচেষ্টা।

জগলুল আস'আদ
সম্পাদক, চিন্তাযান,
সহযোগী অধ্যাপক, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

শহিদের সংখ্যা

ছবি: পথের নাও

বাংলাদেশে কোনো একদিন যদি ১১ হাজার মানুষ মারা যায়, কী অবস্থা হবে ভেবে দেখেছেন?

এইতো কিছুদিন আগে যখন পুলিশ, প্রশাসন, ছাত্রলীগের গুন্ডারা তাণ্ডব চালায়, পুরো সময় জুড়ে হয়তো হাজারখানেক মানুষ ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু, এক দিনে ১১ হাজার হয়নি।

কেউ যদি আপনাকে বলে, টানা ৯ মাস ধরে বাংলাদেশে গড়ে প্রতিদিন ১১ হাজার মানুষ মারা গেছে, আপনি কি বিশ্বাস করবেন?

অর্থাৎ, কোনো দিন ১১ হাজারের জায়গায় ধরুন ২,০০০ মারা গেছে। তাহলে পরেরদিন সেই ৯ হাজার পুষিয়ে দেবার জন্য মোট ২০ হাজার মানুষ মারতে হতো!

আপনার ইউনিয়নে কয়টা বাড়ি? কয়েকটি পরিবার মিলেই তো একেকটি বাড়ি হয়। ধরে নিলাম একটি ইউনিয়নে ৫০০ বাড়ি আছে। গড়ে প্রত্যেক বাড়ির একেকজন মানুষ কি ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে শহিদ হয়েছেন?

আপনি যদি একটু খোঁজ নেন, দেখবেন আপনার গ্রামের মধ্যে হয়তো ২/৩ জন শহিদ হয়েছেন, পাশের কয়েকটি গ্রাম পর আরও ২-৩ জন। এমন অনেক ইউনিয়ন আছে, যেখানে হাতেগোনা ২-৪ জন ছাড়া আর কেউ শহিদ হয়নি। কিছু ইউনিয়নে আছে ৭০-৮০ জন বা শ'খানেক।

আপনি যদি বিশ্বাস করেন একাত্তরে ৩০ লাখ মানুষ শহিদ হয়, তাহলে আপনাকে দুটি পরিসংখ্যান জাস্টিফাই করতে হবে।

১. সেই সময় প্রতিদিন গড়ে ১১ হাজারের বেশি মানুষ মারা গেছে।

২. প্রত্যেক ইউনিয়নে গড়ে ৬৫৫ জন মানুষ মারা গেছে।

স্রেফ এই দুটি পরিসংখ্যান সামনে রাখলেই বুঝতে পারবেন আওয়ামী লীগ স্রেফ রাষ্ট্রপরিচালনায়ই অসৎ না, তারা ইতিহাস বর্ণনায়ও অসৎ।

মুক্তিযুদ্ধকে গ্লোরিফাই করার জন্য ৩০ লাখ শহিদ হয়েছেন এটা উল্লেখ করা জরুরি না। যেমন : জরুরি না দ্বিতীয় স্বাধীনতাকে গ্লোরিফাই করার জন্য হাজার-হাজার শহিদ হয়েছেন বলে উল্লেখ করাটা।

১৯৭১ সালে জুলুমের শিকার হয়ে ৩ জনও যদি মারা যান, মুক্তিযুদ্ধকে গ্লোরিফাই করার জন্য এটাই যথেষ্ট হতো।

কিন্তু, লাখ আর মিলিয়নের পার্থক্য না জানা শেখ মুজিব উল্লেখ করেছিলেন ৩০ লাখ!

তার মুখের কথাই হয়ে যায় ইতিহাস!

ইতিহাস গবেষণা করতে গিয়ে এই সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তুললে তাকে 'মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী' হিসেবে ট্যাগ দেওয়া হতো।

অথচ অনেক ইতিহাসবিদদের মতে সেই সময় যারা মারা যায়, তাদের সংখ্যা হবে দেড় থেকে দুই লাখ।

ইতিহাসের আরেকটি অজানা অধ্যায় হলো, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে যত মানুষ মারা যায়, তারচেয়ে বেশি মানুষ মারা যায় শেখ মুজিবুর রহমানের প্রায় ৪ বছরের শোষণকালে।

শুধুমাত্র ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষেই মারা যায় প্রায় দেড় লাখ মানুষ!

আওয়ামী লীগের বাহ্যিক পতন হয়েছে। কিন্তু, তাদের প্রচারিত ন্যারেটিভ এখনও রয়ে গেছে।

এই জেনারেশন সত্যানুসন্ধানী। ইতিহাস বর্ণনায় আওয়ামী লীগ যেই মিথ্যাচার করেছে, যেই মিথ্যা ন্যারেটিভের মাধ্যমে তারা স্বাধীনতাপরবর্তী সবচেয়ে বড় ভিলেনকে আমাদের সামনে 'হিরো' হিসেবে এতদিন প্রচার করেছে, তাদের সেই মুখোশ উন্মোচন করতে হবে।

আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক পুঁজি এই দুই মিথ্যাচার। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে মিথ্যাচার আর মুজিব বন্দনা।

যেই নেতা মুক্তিযুদ্ধের সময় অনুপস্থিত ছিল, সেই নেতাকে মুক্তিযুদ্ধের 'নেতৃত্বদাতা' বলা যাবে না। বোল্ড অ্যান্ড ক্লিয়ার।

আরিফুল ইসলাম
লেখক ও সাবেক শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হিন্দু-মুসলিম বৈরিতার মনস্তত্ব

ছবি: ইস্ট এশিয়া ফোরাম

১. ভিন্নধর্মের ইস্যুতে আমি পারতপক্ষে কথা বলতে চাই না। বাংলাদেশে এটা এখন নাগরিক অধিকার ও শান্তিশৃঙ্খলার প্রশ্ন। গতকাল এক পোস্টে ব্যাখ্যা করেছিলাম, হিন্দুরা কীভাবে রাজনীতির ট্রাম্পকার্ড হয়েছে এবং এর প্রেক্ষিতে কীভাবে অনিরাপদ হয়ে উঠেছে। আজ আমি হিন্দু-মুসলিমের মনস্তত্ব নিয়ে কিছু কথা বলব, যা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অনাস্থা ও বৈরিতা জারি রেখেছে।

২. ভারতের সাইকোএনালিস্ট সুধীর কাকার হিন্দু-মুসলিমের মনস্তাত্বিক সংঘাত ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিয়ে অনেক গবেষণাপত্র লিখেছেন। The Colors of Violence, The Riot Psychology ইত্যাদি লেখায় তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, এই উপমহাদেশে হিন্দু বা মুসলিমের একটি শিশু জন্মের পরপরই তার ভেতরে সাম্প্রদায়িক চেতনা প্রোথিত হয়। পরিবারের লোকদের কাছে শোনা গল্প, সাংস্কৃতিক আচার অনুষ্ঠান কিংবা ধর্মীয় ঐতিহ্য, চিহ্ন ও প্রতীক তাদের মানসিক পটভূমি নির্মাণ করে। এই পরিপ্রক্ষিতে তারা ভিন্নধর্মের লোকদেরকে "আলাদা" কিংবা "প্রতিপক্ষ" মনে করে। অতীতের বিভিন্ন সংঘাতের ঘটনা থেকে তারা নিজেদেরকে আলাদাভাবে ভিক্টিম ও অপর পক্ষকে দোষী মনে করে। একই সঙ্গে কাল্পনিক বীরত্ব সততার গল্প থেকে প্রচুর মিথ তৈরি হয় এবং শুধু নিজেদের অবস্থানকে সঠিক ও সত্য মনে করে। আর অপর পক্ষকে ভাবে ষড়যন্ত্রকারী শত্রু। সামগ্রিকভাবে যখন রাষ্ট্রের গণতন্ত্রায়ন ও নাগরিক অধিকারের প্রশ্ন আসে, তখন একদল ভাবে আরেক দল গোপনে ষড়যন্ত্র করছে, তারা এই দেশে পাওয়ারফুল হতে চায়, তারা আমাদেরকে ধ্বংস করতে চায়।

সুধীর কাকারের তত্ত্ব নিয়ে অবশ্য বিতর্ক আছে। তার বায়াসনেস নিয়ে পশ্চিমা অ্যাকাডেমিয়ায় বহু অ্যার্টিকেল লেখা হয়েছে। সেসব অ্যাকাডেমিক ও ঐতিহাসিক কচকচানি বাদ দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দু-মুসলিমের মনস্তত্ত্ব, কাজকর্ম ও বাস্তবতা নিয়ে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আলাপ করি।

৩. ভারতের তুলনায় বাংলাদেশে অত্যন্ত উঁচু মাত্রায় সহিষ্ণু ও সম্প্রীতির অবস্থান আছে। তারপরও দুই সম্প্রদায়ের যে মানসিক সংকট, অনিরাপত্তা বোধ, পারস্পরিক ঘৃণা ও সংঘাতপ্রবণতা আছে, তা খতিয়ে দেখা দরকার। আমার নিজের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি থেকে বলতে চাই, বাংলাদেশে মুসলিমদের পক্ষ থেকে হিন্দুরা যে সমস্যায় ভোগে, তার একটি হচ্ছে, তাদেরকে মালাউন ম্লেচ্ছ ইত্যাদি নামে ডাকা ও কটূক্তি করা। এই অভিযোগ অস্বীকার করার উপায় নেই। সামাজিক যোগাযোগেও এ ধরনের কমেন্ট করতে দেখা যায়। মুসলিমদের একটা অংশ তাদেরকে নাপাক, অপবিত্র, মুশরিক, পৌত্তলিক ও জাহান্নামি বলে অপদস্থ করতে থাকে। দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, তাদের শাঁখা সিঁদুর, ধর্মীয় চিহ্ন নিয়ে কটাক্ষ করা হয়, এমনকি প্রতিমা-মূর্তি নিয়ে উপহাস ও অবমাননা করা হয়। তৃতীয়ত, কখনো কখনো তাদের মন্দিরে বা বাড়িঘরে হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। হামলাগুলোর স্বরূপ ও নেপথ্য কারসাজি নিয়ে আগের পোস্টে বিস্তারিত লিখেছি। প্রথম দুটি ব্যাপারে খতিয়ে দেখেছি, এই কাজগুলো করে বেশির ভাগই অশিক্ষিত আধাশিক্ষিত অধার্মিক বা বকধার্মিক মুসলিম। এরা শুধু হিন্দুদের শাখা সিঁদুর নয়, মুসলিমদের আচার ও নারীদের পোশাক নিয়ে কটূক্তি করতেই থাকে। একথা বলে আমি তাদের বাঁচাতে চাচ্ছি না, বা হালকা করতে চাচ্ছি না। এই শ্রেণিটা হিন্দুদের মধ্যেও আছে। আপনি সনাতনী কোনো পেইজে গিয়ে দেখুন, আনন্দবাজার নিউজের কমেন্ট দেখুন - হাজার হাজার এই কোয়ালিটির মানুষ পাবেন। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, একপক্ষ বলবে, 'আমীন না বলে যাবেন না', আরেক পক্ষ বলবে, 'জয় শ্রীরাম!' একপক্ষ দেব-দেবী-মূর্তি নিয়ে ঝগড়া করবে, আরেক পক্ষ মুহাম্মদ (সা.) নিয়ে গালিগালাজ করবে। এরা পালে পালে ঝাঁকে ঝাঁকে কমেন্ট করে তাদের অশিক্ষার প্রমাণ করতে থাকে। এরা যদিও বাস্তবে নন-ভায়োলেন্ট, কিন্তু অনলাইনে অত্যন্ত বিরক্তিকর ও অপমানকর। এরা এতটাই গাণ্ডুপনা করে যে, তাদের মাধ্যমে অসহিষ্ণুতা ও উগ্রতার প্রাথমিক প্রাক্টিস শুরু হয়। এদের মধ্যে একটা গ্রুপ আছে আধাশিক্ষিত ধার্মিক। তারা এসব আজাইরা কথাবার্তা ও উগ্র আচরণ কেবল ভিন্নধর্মের লোকের সাথে করে তা-ই না; নিজের ধর্মের বিভিন্ন উপগ্রুপের সাথেও ঝগড়াঝাঁটি করে। তারা নিজেরা যেটুকু ধর্ম পালন করে, যে মত অনুসরণ করে; তার বাইরে গেলে বাকি সবাইকে জাহান্নামে ও নরকে পাঠিয়ে দেয়। সব পক্ষ ও উপপক্ষের সাথে এদের ঘৃণাচর্চা চলতেই থাকে। বাস্তবে রাস্তাঘাটেও কখনো কখনো এর প্রকাশ ঘটে থাকে। এদের বিরুদ্ধে কীভাবে ব্যবস্থা নেওয়া যায়, সেটা ভাবার সময় এসেছে।

৪. মুসলমানদের জন্য আমি বলব, আপনি যদি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন, ইসলাম মনে চলেন, তাহলে মূর্খতা করার কোনো সুযোগ নেই। ভিন্নধর্মের প্রতি মুমিনের আচরণ কেমন হবে, তা ইসলাম স্পষ্ট করে দিয়েছে। এখানে দুটি কথা বলব। প্রথমত, মুহাম্মাদ (সা.) এসেছেন পৃথিবীর সকল জাতির জন্য রহমতস্বরূপ। কুরআন এসেছে দুনিয়ার সব মানুষের হেদায়াতের জন্য। এই দাবি কেবল মুখে করলে হবে না, আপনার চরিত্র ও আদর্শের মাধ্যমে তা ফুটিয়ে তুলতে হবে। কেন একজন মানুষের জীবনাদার্শ ইসলাম হবে, তা প্রস্ফূটিত হতে হবে আপনার আচরণে। এটাই ইসলামের দাওয়াত। গলাবাজি করে কারো মন জয় করা যায় না। কারও ঠেকা পড়েনি ইসলাম গ্রহণ করার। দ্বিতীয়ত, আপনি অমুসলিমদের সাথে কী করতে পারবেন না, তার স্পষ্ট নির্দেশনা আছে। আল্লাহ বলছেন, "আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা ডাকে, তাদেরকে তোমরা গালি দিয়ো না; কারণ এতে তারাও সীমালঙ্ঘন করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে গালি দেবে।" [সূরা আল আনআম : ১০৮] কুরআন আরও বলছে, "ধর্মের ব্যাপারে জোরজবরদস্তি নেই। ভ্রান্ত মত ও পথকে সঠিক মত ও পথ থেকে ছাঁটাই

করে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে।" [সূরা আল বাকারা : ২৫৬] অত্যন্ত দুঃখজনক হচ্ছে, আমাদের কিছু মাত্রাজ্ঞানহীন হুজুর ও বক্তা ওয়াজের মাঠে গলা ফাটিয়ে কনটেক্সট ছাড়া এমন কিছু বক্তব্য দেয়, যা যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর ও উস্কানিমূলক। এই সামগ্রিক জায়গায় মুসলমানদের আত্মসমালোচনা ও সংশোধনের সুযোগ আছে, এটা কোনো রাজনৈতিক কৌশল নয়, এটাই আপনার ধর্ম, যদি পরকালে আপনি আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে চান।

৫. এবার আসি হিন্দুদের পক্ষ থেকে মুসলিমরা কী ধরনের বার্তা পায়! সাধারণভাবে গ্রামগঞ্জে পারিবারিকভাবে, স্কুলকলেজে বন্ধু হিসেবে, বা কর্মক্ষেত্রে সহকর্মী হিসেবে হিন্দু-মুসলিমের সম্পর্ক বেশ ভালো। যারা অনলাইনে বিষেদাগার করে, তাদের ব্যাপারে আগেই উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে তেমন কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা আছে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বা সামাজিক অধিকারের প্রশ্নে। আমার কাছে মনে হয়েছে, এই সমস্যাটা তিন ধরনের। প্রথমত, বাংলাদেশের যেকোনো ইস্যুতে মুসলিমরা ছিন্নবিচ্ছিন্ন হলেও হিন্দুরা ঐক্যবদ্ধ। তাদের সম্প্রদায়ের সংহতি হিসেবে সেটা চমৎকার, কিন্তু অনেকক্ষেত্রে ইজম আকারে ব্যবহৃত হয়, এবং তখন মুসলিমরা আস্থাহীনতায় ভোগে। বিশেষ করে যখন মুসলমাদের অধিকারের প্রশ্ন আসে, তখন হিন্দুরা কথা বলে না, উল্টো ঐক্যবদ্ধ বিরোধিতা করে। ওয়ার অন টেররের নীরব সঙ্গী হয়ে মুসলমানদের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে তারা একজোট হয়। বাঙালি সংস্কৃতিতে বাঙালি মুসলমানদের কোনো আচারকে তারা স্বীকার করতে চায় না। উল্টো ঝেঁটিয়ে বিদায়ের যে বয়ান, সেখানে তারা নেতৃত্ব দেয়। এই যে আরবি ক্যালিওগ্রাফির কথা ধরুন, সেটাতে যেসব ইসলামবিদ্বষী হাউকাউ করছে, তাদের সাথে গলা মিলাচ্ছে হিন্দুরা। দেওয়ালে ইংরেজি লেখা থাকতে পারবে, সংস্কৃত থাকতে পারবে, সকল সাইনবোর্ড ইংরেজি এমনকি ফরাসি হতে পারবে, কিন্তু আরবি হতে পারবে না। দাড়ি-টুপি-বোরকা রাস্তায় দেখলে, ইসলামের কোনো চিহ্ন দেখলেই দেশ পাকিস্তান হয়ে যাবে, এই জুজুর ভয় দেখিয়ে মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার লঙ্ঘনে তারা সহযোগী। তারা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশের পাবলিক স্পিয়ারে হলে-হোস্টেলে সব জায়গায় গোমাংস নিষিদ্ধ চায়, অথচ মুসলমানদের জন্য আলাদা হাঁড়িপাতিলে রান্না করা এমন কোনো ব্যাপার না। কুরবানির সময়ে তারা প্রকাশ্যে মুসলমানদের এই ধর্মীয় ইবাদতের প্রতি কটাক্ষে অংশগ্রহণ করে। এ রকম আরও উদাহরণ দেওয়া যাবে। আপনার যদি গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও নাগরিক সুবিধাদি নিয়ে ধারণা থাকে, তবে এই ইস্যুতে কারা অধিকারবঞ্চিত, তা পড়াশোনা করে দেখুন। বহু নাগরিক ধর্মীয় অধিকার ও সাংস্কৃতিক কারণে হিন্দুদের সাথে মুসলমানদের আস্থার সংকট তৈরি হচ্ছে। ধর্মীয় পার্থক্য যা-ই থাকুক, নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকারে একটা ন্যায়সংগত সমঝোতা জরুরি।দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় নিপীড়নে যারা নেতৃত্ব দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা হিন্দু ছিল, তারা অত্যন্ত বেপরোয়া ও জিঘাংষাপরায়ণ ছিল। এক ওসি প্রদীপের মতো খুনি আর দ্বিতীয়টি ছিল না। এক বনজ কুমারের মতো দুর্ধর্ষ সাম্প্রদায়িক কেউ ছিল না। অজ্ঞাত কারণে সাতক্ষীরার বেশির ভাগ থানার ওসি ছিল হিন্দু। তাদের অত্যাচারের মাত্রার কোনো সীমা ছিল না। তুচ্ছ কারণে ক্রসফায়ার করতে তারা ওস্তাদ ছিল। সাতক্ষীরা কৃষক-শ্রমিক-জেলে যে কাউকেই জামায়াত-শিবির নাম দিয়ে আটক করে নির্যাতন করে টাকা নিয়ে ছেড়ে দিত, অথবা জেলে ভরত। এলাকার আওয়ামী লীগ বা ছাত্রলীগের নেতৃত্বে যেসব হিন্দু ছিল, তারা ছিল সবচেয়ে বেশি মারমুখী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির। তৃতীয়ত, রাজনীতিতে আওয়ামী লীগের ভ্যানগার্ড ও ভারতের অনুগত হওয়া। আওয়ামী ইস্যুতে গত পেস্টে ব্যাখ্যা করেছি। ভারতের জনগণের সাথে ধর্মীয় কারণে মানসিক যোগ থাকা সমস্যা না, কিন্তু তাদের রাষ্ট্রীয় নীতির প্রতি অনেকের প্রীতি ও আনুগত্য দৃষ্টিকটু পর্যায়ের। এসব ব্যাপারে এখন হিন্দু ভাইয়েরাও কথা তুলছেন। শেখ হাসিনার পতনের পর দলীয় চাটুকারিতা নিয়ে একজন হিন্দু ভাই লিখেছেন, "চেটে খাওয়া হিন্দুদের জন্য খেটে খাওয়া হিন্দুরা বিপদে।" ভারত ইস্যুতে একজন লিখেছেন, "আমাদের হিন্দুদের বেশির ভাগ যতটা না বাংলাদেশপন্থি,

তার চেয়ে বেশি ভারতপন্থি।" অনেক হিন্দুর অ্যাক্টিভিটি দেখলে পরিষ্কার হয়ে যায়, তারা ভারতের প্রতি কতটা অনুগত। ভারতের যেকোনো ইস্যুতে এমনকি হিন্দুত্ববাদের নামে নির্যাতনেরও সমর্থক হয়েছে। ভারতে গোমাংস ইস্যুতে যত নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে, বাংলাদেশের হিন্দুরা কথা বলা তো দূরের কথা; উল্টো সাফাইও গেয়েছে। বাবরি মসজিদ ধ্বংসে উল্লাস করেছে। ভারতে সংখ্যালঘু মুসলিমরা যেই লেভেলে নির্যাতিত, সেটা সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক দুই দিক দিয়ে। বাংলাদেশে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও তার চেয়ে বেশি রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার। নামাজ পড়ার অপরাধে, ইসলামি বই থাকার অপরাধে, মাদরাসায় পড়ার অপরাধে, এমনকি ঘরে কুরআনের তাফসিরগ্রন্থকেও জিহাদি বই নাম দিয়ে নির্বিচার আটক করা হয়েছে, গুম করা হয়েছে, আয়নাঘরে রাখা হয়েছে। আওয়ামী লীগের সকল নিপীড়ন, অবৈধ ক্ষমতা দখল, ভোট চুরি, গণহত্যা সবকিছুতে তারা ফ্যাসিবাদের সহযোগী হয়েছে , সচেতনে কিংবা অবচেতনে।

৬. এটা স্পষ্ট করতে চাই, এসব অপরাধে অবশ্যই সব হিন্দু জড়িত নয়। বেশির ভাগ হিন্দু রাজনীতিবিমুখ, নিরীহ ও শান্তিপ্রিয়। কিন্তু নেতৃত্বস্থানীয়দের অপকর্ম থেকে, রাজনীতির হাতিয়ার হওয়া থেকে, সামষ্টিক অবস্থান থেকে মুসলিমদের কাছে অবিশ্বস্ততার ও সন্দেহপ্রবণতার ইমেজে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আওয়ামী ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে একটি সফল ছাত্রগণ অভ্যুত্থানের পরেও হিন্দুরা সামষ্টিকভাবে স্বৈরাচারের পক্ষে মাঠে নেমেছে। এত এত মানুষ, মাদরাসার ছাত্র, রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে পাহারা ও সুরক্ষার জন্য তাদের দুয়ারে গেলেও তাদের অবস্থান অনেকটাই অকৃতজ্ঞতার। সমস্ত সুবিধা পেয়েও তারা ভিক্টিম রোল প্লে করে। বর্তমানে প্রতিবাদের নামে তাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য স্পষ্ট। তারা একটা অস্থিতিশীলতা দেখানোর টুল হতে চাচ্ছে। আওয়ামী দাবার গুটি হতে চাচ্ছে। এই কাজে তারা নিজের নাক কাটতেও রাজি। নিজেদের মন্দিরে নিজেরা আগুন দিতে গিয়ে আটক হয়েছে, এমন কয়েকটি ভিডিও সামনে এসেছে। ভারতীয় মিডিয়া তাতে উস্কানি দিচ্ছে। খোদ পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ এ ব্যাপারে শান্ত থাকতে বলেছে। ভুয়া খবর প্রচার নিয়ে বিবিসিও রিপোর্ট করেছে। অথচ ছাত্রজনতার আন্দোলনে অন্তত ৩০ জনের মতো হিন্দু প্রাণ হারিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। যারা সত্যিকার দেশের জন্য আত্মত্যাগী, গণতান্ত্রিক রাজনীতি ও মানবাধিকার ধারণ করে; এমন হিন্দুরা এবার প্রকাশ্যে তাদের সামষ্টিক অবস্থানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সত্য কথা বলছেন, সম্প্রীতি ও সহাবস্থানে রাষ্ট্র সংস্কার ও দেশ গড়ার কথা বলছেন। তাদের প্রতি স্যালুট। এই ভাই-বোনেরা আবার সত্য কথা বলার অপরাধে নিজেদের গোষ্ঠীর কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠছে।

৭. আমার এ পর্যবেক্ষণ নিতান্তই ব্যক্তিগত। দেশের দুই সম্প্রদায়ের মানুষ কী ধরনের মানসিকতা পোষণ করে, কী ধরনের অফেন্ডড ফিল করে, সেসব তুলে আনার চেষ্টা করলাম। রেন্ডম কয়েকজন হিন্দু ও কয়েকজন মুসলমানের সাথে কথা বলে আমার এ উপলব্ধি হয়েছে। এই লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, উভয় সম্প্রদায়ই আত্মপর্যালোচনা করুক। কীভাবে তাদের কথা ও কাজে পরস্পরের প্রতি আস্থা, বিশ্বাস ও সম্প্রীতি নির্মাণ করবে। মুসলমানদের করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিলাম। হিন্দুদের বিষয়গুলো তাদের সচেতন মানুষদের ভাবতে হবে। এই বিষয়গুলো আলাপ করা আমার নিজের কাছে অস্বস্তিকর। অনেক মানুষই ভুল বুঝে থাকেন। তারা শত্রুজ্ঞান করে থাকেন। তবুও বাস্তবে প্রচলিত যে ধারণা ও মনোভাব, তা আমি তুলে আনার চেষ্টা করলাম। সত্যিকার সম্প্রীতি উভয় পক্ষের মনস্তত্ত্বের পরিবর্তন আনতে হবে।

তানিম ইশতিয়াক
প্রভাষক, পটুয়াখালী সরকারি কলেজ।

শিক্ষক না রাজনৈতিক কর্মী

ছবি: যাস্ট নিউজ বিডি

শিক্ষক নামের আড়ালে ভয়ংকর রাজনৈতিক কর্মীদের ছাত্ররা মেনে নেয়নি, যার বহিঃপ্রকাশ দেখছেন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চৌহদ্দি কিংবা ক্লাসে কোনো শিক্ষকের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা আর কোনো দলের মেঠো রাজনৈতিক কর্মীর মতো আচরণ করা বা ভূমিকা রাখা এক জিনিস নয়। এই জিনিসটা যদি আপনি না বোঝেন, তাহলে ছাত্ররা জোর করে তাদের শিক্ষককে কেন পদত্যাগ করাচ্ছে এইটা বুঝতে পারবেন না।

এমনটি তো আগে কখনোই ঘটেনি, এবার কেন হচ্ছে? গত পনেরো বছরের ইতিহাস একটু দেখুন। স্কুলের একজন হেড মাস্টার কিংবা কলেজের একজন প্রিন্সিপাল হতে গেলে আগে কনফার্ম করতে হতো এই শিক্ষক সরকারি দলের একজন সাচ্চা ঈমানদার, নিরেট কর্মী। তাকে প্রতিনিয়ত সরকারি দলের আদর্শকে কেবল ধারণই নয়, নগ্নভাবে প্রকাশ ঘটাতে হতো। ক্লাসের মধ্যে কোনো শিক্ষককে জয় বাংলার স্লোগান দিতে এই পনেরো বছরের আগে কখনো কোনো শিক্ষককে দেখছেন? একটু বুকে হাত দিয়ে বলুন তো!

সরকারি কলেজের কথা ধরুন। হয়তো দু-একটা কেস বাদে প্রিন্সিপাল হওয়ার জন্য মোটাদাগে একজন অধ্যাপককে আগে প্রমাণ দিতে হতো তিনি জয় বাংলার একনিষ্ঠ ঈমানদার ও আমলদার। সরকারি দলের স্থানীয় এমপি, মন্ত্রী বা কমপক্ষে দলীয় সভাপতি বা সেক্রেটারির মতো নেতাদের সাক্ষাৎ এবং আশীর্বাদ আগেভাগে নিতে হতো। প্রিন্সিপাল হওয়ার পরে সর্বপ্রথম টুঙ্গিপাড়ায় গিয়ে তাওয়াফ সম্পন্ন করে মুজিববাদী ঈমানদার হিসাবে নিজেকে প্রমাণ দিতে হতো, ঈমানকে জ্বালাই করে ঈমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া লাগত। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেসবের ছবি আপলোড দিয়ে তার প্রমাণ দেখানো লাগত। সরকারি দলের এমপি বা সরকারের কোনো মন্ত্রী এলাকায়

সফর করলে তাকে রিসিভ করতে কিংবা বিদায় জানাতে অন্যান্য পাইক-পেয়াদার মধ্যে প্রিন্সিপাল মহোদয়কেও শামিল থাকতে হতো বা নিজের থেকেই থাকতেন। এমন প্রিন্সিপাল সম্পর্কেও শুনেছি যে এই সময়ে কোনো তৃতীয় শ্রেণির মনুষ্য জাতের নীতিবিবর্জিত মন্ত্রীর পা ছুঁয়ে সালাম করার কথা। একজন শিক্ষক, একজন অধ্যাপক ক্ষমতার পা ছুঁয়ে সালাম!

এখন বলুন। এই জিনিস গত পনেরো বছরের আগে কখনো দেখেছেন? আওয়ামী লীগ তো এর আগেও ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। তখনও তো স্কুল ছিল, কলেজ ছিল। স্কুল কলেজের প্রিন্সিপালরা ছিলেন। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়া, এই ঘটনা তখন কেউ দেখেছেন? এখন কেন হচ্ছে?

হ্যাঁ, ক্ষেত্র বিশেষে যে অতি উৎসাহ এবং বাড়াবাড়ি হতে পারে না, তা অস্বীকার করা কঠিন। কিন্তু সেখানেও রাজনীতি আছে। হেড মাস্টার বা প্রিন্সিপালের পদ নিয়ে খোদ সরকারি দলপন্থি শিক্ষকদের মধ্যেও কাড়াকাড়ি থাকাটা অস্বাভাবিক না। পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার চেয়েও রাজনৈতিক আনুগত্য যখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন এই কাড়াকাড়ি থাকাটা এবং হওয়াটা খুবই মামুলি। যে প্রত্যাশী দলীয় শিক্ষকরা রাজনীতির এই প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে এই পদগুলোতে যেতে পারেননি তাদের মধ্যেও হয়তো ক্ষোভ থাকতে পারে। এই সুযোগে তারাও যে কিছুটা হলেও প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সঙ্গিন (ভোলাটাইল) এই অবস্থাকে (সিচুয়েশন) ব্যবহার করছেন না, তাই-বা জোরের সাথে বলি কীভাবে?

এর বাইরেও স্কুল শিক্ষকদের একটা বড় অংশের ব্যাপারে প্রাইভেট টিউশন বা কোচিং এর নামে বাণিজ্য করার বড়সড়ো অভিযোগ রয়েছে। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট না পড়লে পরীক্ষার খাতায় কম নম্বর দেওয়ার প্রবণতার অভিযোগ কোনো কোনো শিক্ষকের বিরুদ্ধে আছে। এবং এসব অভিযোগ নেহায়েত তুচ্ছ এবং ভিত্তিহীন নয়। এ জাতীয় কর্মকাণ্ড কেবল অনৈতিক নয়; বরং বেআইনি ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ। একজন ছাত্র যখন কোনো শিক্ষককে এই অপরাধ করতে দেখে সুযোগ পেলে সে তার প্রতিকার নিজেই করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

কাজেই যে ছাত্ররা আজকে জোর করে এই শিক্ষকদের পদত্যাগ করাচ্ছে তার পটভূমি আগে বুঝতে হবে। যখন এই কাজটি তারা করছে তখন তারা সংশ্লিষ্ট এই শিক্ষককে শিক্ষক হিসেবে দেখছে না, দেখছে স্রেফ একজন রাজনৈতিক কর্মী বা দুর্নীতির বরপুত্র হিসেবে। তাদের মানসপটে তখন ভেসে উঠছে কোনো শিক্ষক ব্যক্তিত্ব নয়, একজন দুর্নীতিগ্রস্ত বা মেঠো রাজনৈতিক কর্মীর ব্যক্তিত্ব, যে পরিবেশ বা স্পেসে তারা তা দেখতে চায়নি। গত পনেরো বছরের ফ্যাসিবাদ এই অবস্থা তৈরি করেছে। একটা মসজিদ তাও আবার জাতীয় মসজিদের খতিব যখন সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে পালিয়ে যায় বা যাওয়া লাগে তখন, এই ফ্যাসিবাদের ভয়াবহতা বুঝতে রকেট সাইন্স বোঝার মতো আইকিউর দরকার পড়ে না।

একজন ক্ষুদ্র শিক্ষক হিসেবে বলতে পারি, এভাবে হেনস্তা করে শিক্ষকদের পদত্যাগে বাধ্য করা দেখতে কষ্ট হয়। এটা কখনো কাম্য ও রম্য নয়। ভবিষ্যতে এমনটি যাতে আর না ঘটে, সে দিকে খেয়াল রাখার পাশাপাশি দ্রুত ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসে বসার ব্যবস্থা করা দরকার। শিক্ষককে মেঠো রাজনৈতিক কর্মী নয়, আগে শিক্ষক হয়ে ওঠা দরকার। তবেই ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক আগের জায়গায় ফিরে আসতে পারে।

ড. মো নজরুল ইসলাম
প্রফেসর, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।

বিদেশে বাংলাদেশি এম্বাসির উদাসীনতা ও গাফিলতি : সমস্যা ও সমাধানের জন্য কিছু সুপারিশ।

ছবি: বাংলাদেশ দূতাবাস, মানামা

বর্তমানে প্রায় এক কোটি বাংলাদেশি দেশের বাইরে বিভিন্ন দেশে প্রবাসী হিসেবে অবস্থান করছে। যারা রেমিট্যান্স পাঠানোর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি এম্বাসি বা কনস্যুলেট বাংলাদেশি প্রবাসীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবা কেন্দ্র। প্রবাসে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হলে এম্বাসিই অনেকের কাছে শেষ ভরসাস্থল। তবে অনেক সময় এম্বাসির কর্মকর্তাদের উদাসীনতা ও গাফিলতির কারণে প্রবাসীরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। এই সমস্যাগুলো প্রবাসীদের জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলার পাশাপাশি দেশের ভাবমূর্তিকেও ক্ষতিগ্রস্ত করছে। যেহেতু দেশে সাম্প্রতিক বিপ্লবের পরে নানাবিধ খাতে সংস্কার করা হচ্ছে তাই সরকারের কাছে আমাদের এই ক্ষুদ্র অনুরোধ যা প্রবাসীদের নিত্যদিনের সঙ্গী।

সমস্যাগুলো

১. পাসপোর্ট ও ভিসাসংক্রান্ত জটিলতা : পাসপোর্ট নবায়ন, ভিসা প্রক্রিয়া, জন্ম নিবন্ধন ইত্যাদি কাজে অতিরিক্ত সময় ও জটিলতা। দৈনিক প্রথম আলো"-তে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী অনেক প্রবাসীকে তাদের পাসপোর্ট নবায়নের জন্য মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয়। যার জন্য প্রবাসীদের সময় , শ্রম ও অর্থের অপচয় হয়। যদি কোনো ব্যক্তি মেয়াদ শেষের আগেই নতুন পাসপোর্ট হাতে না পায়, তবে সেক্ষেত্রে নানাবিধ জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। দেশের বাইরে সাধারণত ৫ বছর মেয়াদি এমআরপি পাসপোর্ট দেওয়া হয়। আর সেখানে আপনার অন্য কোনো অপশনও থাকে না।

২. সেবা প্রদানে দেরি : প্রয়োজনীয় সেবা যথাযথ সময়ে না পাওয়া। একটি অনলাইন জরিপে দেখা গেছে যে, অনেক প্রবাসীকে তাদের কনস্যুলার সেবা পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হয়। যা প্রবাসীদের নানাবিধ জটিলতার সম্মুখীন করে।

৩. প্রবাসীদের সমস্যায় সহায়তা না করা : বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়লে প্রবাসীদের পর্যাপ্ত সহায়তা না করা। একটি প্রবাসী সংগঠনের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিদেশে আটকে

পড়া বাংলাদেশিদের কেউ কেউ এম্বাসি থেকে পর্যাপ্ত সহায়তা পাননি।

৪. যোগাযোগব্যবস্থার অভাব : প্রবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগব্যবস্থা দুর্বল হওয়া। একটি সরকারি তদন্তে দেখা গেছে যে, অনেক এম্বাসিই প্রবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

৫. কর্মকর্তাদের অদক্ষতা : অনেক সময় এম্বাসির কর্মকর্তারা তাদের কাজের প্রতি যথাযথ দায়িত্বশীল না হওয়া। প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একটি তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু এম্বাসির কর্মকর্তা তাদের কাজের প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেন না।

এ সকল সমাধানে সমাধানে করণীয়

১. পাসপোর্ট সমস্যার সমাধান : দেশের বাইরে থেকে যেন প্রবাসীরা ১০ বছর মেয়াদি ই-পাসপোর্ট পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

২. দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নিয়োগ : দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিদের এম্বাসিতে নিয়োগ দেওয়া। যাতে করে সেবার মান বাড়ার পাশাপাশি বিদেশের মাটিতে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে।

৩. সেবা প্রদানের মান উন্নয়ন : সেবা প্রদানের মান উন্নয়নের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা এবং কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। যাতে স্বল্প সময়ে অধিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করা যায়।

৪. প্রবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি : প্রবাসীদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর জন্য অনলাইন পোর্টাল, হেল্পলাইন ইত্যাদি সুবিধা সৃষ্টি করা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারের মাত্রা বৃদ্ধি করা।

৫. জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা : এম্বাসির কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত মূল্যায়ন করা এবং প্রবাসীদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। যাতে করে সুষ্ঠু সেবা নিশ্চিত করা যায়।

৬. ভ্রাম্যমান সেবা : প্রবাসীদের দূরবর্তী এলাকায় ভ্রাম্যমাণ সেবা প্রদান করা। যাতে করে দূরবর্তী স্থানের প্রবাসীরাও সেবা পায়।

৭. প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা বাড়ানো : প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার জন্য উৎসাহিত করা এবং প্রবাসীদের সমস্যা সমাধানে তাদের সক্ষমতা বাড়ানো।

৮. প্রবাসীদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা : প্রবাসীদের অভিযোগ দ্রুত ও নিরপেক্ষভাবে নিষ্পত্তির জন্য একটি স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশি এম্বাসি বাংলাদেশি প্রবাসীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সেবা কেন্দ্র। এম্বাসির কর্মকর্তাদের উদাসীনতা ও গাফিলতির কারণে প্রবাসীরা যে সমস্যার সম্মুখীন হন, তা দূর করার জন্য সরকারকে দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। উপরিউক্ত সুপারিশগুলো কার্যকর করা হলে প্রবাসীরা আরও ভালো সেবা পাবে এবং দেশের ইমেজও উন্নত হবে।

মোঃ সাঈদ পারভেজ

নর্থ চায়না ইলেকট্রিক পাওয়ার ইউনিভার্সিটি, বেইজিং, চীন।

নতুন স্বাধীনতার সঞ্চার

শোকের ছায়ায় ঢাকা মাটি,
গান মুখরিত প্রতিবাদের সুরে।
বীরেরা চলে যায়, যায়,
জীবনের আলোয় মুক্তির জ্বলে প্রাণ।

নীরব চিৎকারে সহস্র প্রাণ,
স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা বুকে বাঁধা।
যুদ্ধের মাঠে ছাত্রের পালা,
নিরাশার চোখ আশায় রাঙানো।

শুধু দেখা নয়, আমরা কি বলবো না,
প্রাণের দাবি, প্রাণের টানে বলো?
আমাদের কথা, যুদ্ধ আমাদের,
শান্তির প্রত্যাশায় প্রতিটি বুলি জুড়ো।

পুলিশের লাঠি, গুলির শব্দে,
স্বপ্ন আমাদের ছিন্ন ভিন্ন হয়।
অটল আমাদের পদক্ষেপ,
শ্বাসে শ্বাসে প্রতিবাদের বেঁধেছি তান।

শহিদের রক্তে ভেজা এই মাটি,
বুনে চলে গণতন্ত্রের বীজ।
এই মাটি, এই বাতাস, এই স্বপ্ন,
খোদাই করা যাদের নাম স্মৃতির পাতায়।

স্বাধীন হোক ভাবনা, কলম স্বাধীন হোক,
মিথ্যের প্রাচীর ভেঙে সত্যের পথ চল।
নির্মাণ করি নতুন ভোর,
বাঁচার অধিকার যেখানে সবার সমান।

মিছিলের ঢেউ ভাঙে শহরের নীরবতা,
স্বাধীনতার গানে বাজে প্রতিধ্বনি।
তরুণের কণ্ঠে বিপ্লবের সুর,
ধুলোমাখা পথে হাঁটে নতুন প্রাণ।

এসেছে গুলিভর্তি হেলিকপ্টার এসেছে ট্যাংক,

সহস্র পান্ডব রাইফেল-বন্দুক হাতে

স্বৈরাচার বলেছে তথাকথিত রাজাকার থেকে,

তাদের তথাকথিত সাধিন্তা রক্ষার্থে।

কান্নার সাগরে ভাসে প্রিয় মুখগুলো,
ভবিষ্যৎ গড়ার তরে যারা গেছে চলে।
তাদের স্মৃতি, আমাদের শক্তি,
তাদের স্বপ্ন, আমাদের সাহস, আমাদের অস্ত্র।

রক্ত ঝরেছে, নয় সে বৃথা,
প্রতিটি কণায় শান্তির বীজ রোপণ।
আমাদের দাবি—সত্যের জয়,
অন্যায়ের প্রাচীর ভেঙে গড়ি নতুন দেশ।

মৃত্যুর পরেও জেগে ওঠে নতুন প্রত্যয়,
তুমি, আমি, আমরা—এক সাথে চলি সবায়।
মানবাধিকারের চাদরে মুড়ি দিয়ে,
মুক্তি না হলে, মরি দিয়ে বলি এক কণ্ঠে। এই লড়াই শুধু
আজকের নয়, প্রতিদিনের,
শান্তি, সাহস, সমানুভূতির পথ ধরে।
এগিয়ে যাবো আমরা, প্রতিবাদের পতাকা তুলে,
গণতন্ত্রের বুকে জাগাবো নতুন সূর্যের আলো।

আলমাস ফারহান অর্ণব

নানজিং ইউনিভার্সিটি অফ ইনফরমেশন সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, নানজিং, চীন।

চব্বিশের জুলাই

হৃদয়-চৈতন্যের এক ভয়াল তাজরেবা চব্বিশের এ জুলাই,

শৌর্যময় ইতিহাস রচনার স্মরণীয় এক পুনরাবৃত্তি!

মুসাবী নিরস্ত্রতার বিপরীতে ফেরাউনীয় নারকীয়তার চাক্ষুষ সাক্ষী এ জুলাই।

এ তো সেই জুলাই,

যাতে ন্যায়ানুগ দাবিতে বুকের তাজা খুন ঢেলে

অবিচলতার চরম সাক্ষ্য দিলো সাম্যবাদীরা,

যদিওবা এখনও বাকি রয়ে গেছে পরম পরিণতি ও ফলাফল!

কবিতার অনুভূতিকে পাথরে পরিণতকারী হে জুলাই!

অশ্রু শুকিয়ে আজ মরুভূমি–ওই মায়ের চোখ,

বিলাপহীন নির্বাক বাবার আসমান-অভিমুখি হা করা ওই মুখ,

আদুরে ভাই-বোনের অন্তরফাটা কান্নার রোল আর

খুনরাঙা পথ ও সেগুলোতে পড়ে থাকা অস্ত্র এখনও সে তান্ডবের সাক্ষী!

শান্তিকামী যুবকের উরুতে বত্রিশ ইঞ্চি রামদার কোপ,

গুলিতে থেতলানো—মগজ বেরিয়ে পড়া লোহিত মাথা!

বুলেটের আঘাতে নয় বছুরে শিশুর ছোট্ট ঝাঝরা বুক,

জানালার কাছে পড়ুয়া শিশুর চক্ষু-মস্তক ভেদ করা গুলি আর বুক চিতিয়ে দাঁড়ানো শহিদকে প্রত্যক্ষকারী এই জনপদ, সাক্ষ্য দিয়ো তুমি!

ত্রি-বর্ষী শিশু আর নারীত্বের প্রতি চরম অপমান-জুলুমেও মেতে উঠতে বাকি রয়নি কাপুরুষোচিত এ অমানুষেরা!

শহিদের সম্মানে যেখানে গোসলহীন জানাযার হুকুম,

হায় দূর্ভোগ! সেখানে শহিদের শরীরে নরপিশাচের লাথি দেখতে হলো অধম এই চোখ দুটিকে!

যদিও শাহাদাতের অমিয় সুধা লাভের সুযোগ আমার হয়নি, তবুও সত্যানুসারী ন্যায়ানুগদের দাবি নিয়ে শেষতক রাজপথে টিকে ছিলাম ও আছি—সাক্ষী থেকো হে জনপদ!

সবশেষে কবির ভাষায় জানাতে চাই,

সাবধান! আমার মাকে যেন কেউ গোলামের গর্ভধারিণী না বলে।

জালিস মাহমুদ

যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

জালিমের বুলেটের সামনে

গণঅভুত্থানের উন্মুক্ত ময়দান থেকে

আমি সাঈদ বলছি ডেকে,

পিছুপা হইওনা বন্ধু আমার

জেগে ওঠো তোমরা আবার।

আমি কি ভয় পায়
আল্লাহ যদি হয় সহায়,
মৃত্যুর ফয়সালা আসমানে হয়
ওদের দেখে কেন ভয়।

আমার যদি জন্ম হত শতবার
ভয় পেতাম না কোনোবার,
জালিমের বুলেটের সামনে যাওয়ার
বুক পেতে দিতাম প্রতিবার।

ঐ বুলেটের আঘাতে বারবার
হৃদপিণ্ড হয়ে যেত ছারখার,
পেশী ছিঁড়ে বেড়োতো হার
এগিয়ে যেতাম আমি আবার।

মোঃ আব্দুল আলিম

লেখক, শিক্ষক ও সাংবাদিক ।

Quota Reform Movement:
Bangladesh's Second Independence (Timeline in Pictures)

Courtesy: The Business Standard

Jun 6, Thursday: Students begin to stage protests against the court order declaring the scrapping of the quota system illegal.

Courtesy: Asia News Network & The Report

Jul 7, Sunday: A 'Bangla Blockade' program is held nationwide. The capital comes to a standstill amid massive protests. The protesters announce a 'Bangla Blockade' programme for the following day.

Courtesy: The Business Post & Somoy TV

Jul 14, Sunday: The High Court publishes the full verdict reinstating the quota system. The students start protests over the use of the word '***Razakar***' (Pakistani collaborators) by Prime Minister Sheikh Hasina at a press briefing.

Courtesy: The Prothom Alo & New Age

Jul 15, Monday: Bangladesh Chhatra League and other government supporters attack the student protesters at the Dhaka University campus.

Courtesy: Anondabazar & The Christian Index

Jul 16, Tuesday: An appeal was filed to the Appellate Division. Violence spreads across Bangladesh amid road blockades as six people are killed. The video of a university student Abu Sayed being shot dead by police goes viral.

Courtesy: PBS

Jul 19, Friday: Tensions escalate in Dhaka and other areas, resulting in widespread clashes and vandalism, with a curfew imposed and over 56 fatalities reported. The Anti-Discrimination Student Movement continues its protests, demanding an apology from the prime minister and the resignation of two ministers, while three protest coordinators meet government officials to present their demands. And a nationwide internet blackout was implemented for an infinite period.

Courtesy: The Business Standard & AP News

Jul 31, Wednesday: Students hold a 'March for Justice' to protest against violence and mass arrests related to the quota reform movement, facing police blockades and clashes at Dhaka University and other locations. In response, Prime Minister Sheikh Hasina called for international assistance for an investigation into the unrest, while the United Nations expressed willingness to send a delegation to look into the situation.

Courtesy: Reddit

Aug 3, Saturday: A huge public gathering at the Central Shaheed Minar leads to a ***one-point demand*** for the Sheikh Hasina government to resign.

Courtesy: The Observer BD

Aug 5, Monday: A massive crowd of students and protesters marched to Dhaka for the '***Long March to Dhaka***' organized by the Anti-Discrimination Student Movement, leading to Prime Minister Sheikh Hasina's resignation and flight to India. Following her departure, Chief of Armed Forces Gen Waker-Uz-Zaman announced the formation of an interim government, prompting celebratory victory processions in the whole country. President Mohammad Shahabuddin met with various political parties, including the BNP and Jamaat-e-Islami, and subsequently announced the dissolution of parliament and the establishment of an interim government.

Raoha Bin Mejba
University of Science and Technology of China (USTC), China.

মহাপ্রাচীর ম্যাগাজিন সম্পর্কে আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে

অথবা পরবর্তী সংখ্যায় লেখা পাঠাতে মেইল করুন:

mahaprachir@outlook.com

পূর্ববর্তী ম্যাগাজিনের সংখ্যাগুলো পেতে ভিজিট করুন:

https://www.bcysa.org/magazine

চীনে শিক্ষা, স্কলারশিপ, বাণিজ্য এবং চীন ও বাংলাদেশ সম্পর্কে আপডেট পেতে চোখ রাখুন:

ফেইজবুক পেইজ:

www.facebook.com/bcysaofficial

ফেইসবুক গ্রুপ:

www.facebook.com/group/bcysa.cn

বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন:

www.bcysa.org